গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

জেলা তথ্য ঃ ফেনী

আবু মোস্তফা কামাল উদ্দিন
এবং
মোঃ সাইদ ইফতেখার

জানুয়ারি, ২০০৫

প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিস
সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প

জেলা তথ্য :
ফেনী

প্রকাশকাল :
জানুয়ারি, ২০০৫

প্রকাশনায় :
পিডিও-আইসিজেডএমপি
সায়মন সেন্টার (৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা)
বাড়ি : ৪এ, রোড : ২২
গুলশান ১, ঢাকা ১২১২
ফোন : (৮৮০-২) ৮৮২৬৬১৪, ৯৮৯২৭৮৭
ফ্যাক্স : (৮৮০-২) ৮৮২৬৬১৪
ই-মেইল : pdo@iczmpbd.org
ওয়েব সাইট : www.iczmpbangladesh.org
ও
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)
বাড়ি : ১০৩, রোড : ০১
বনানী, ঢাকা ১২১৩।

প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিস - সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (পিডিও-আইসিজেডএমপি) বাংলাদেশ, নেদারল্যান্ড ও যুক্তরাজ্য সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত একটি বহুখাতভিত্তিক এবং বহুপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক উদ্যোগ, যেখানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হচ্ছে মূল মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) মূল সংস্থা।

মুদ্রন সহযোগিতায় :

ISBN :

তথ্যের প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়নের একটি প্রয়াস
জেলা তথ্য : ফেনী

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি অন্য অঞ্চল থেকে স্বতন্ত্র। একদিকে প্রকৃতির অপার সম্পদ অন্যদিকে প্রকৃতির বিরূপতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই এ অঞ্চলের ১৯টি জেলার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। এ লক্ষ্যে পিডিও-আইসিজেডএম প্রকল্প একটি নীতিমালা প্রণয়ন ও কর্মকৌশল নির্ধারণ করেছে। কর্মকৌশলগুলোর ভিত্তিতে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ কার্যকরি করতে উপকূলীয় অঞ্চলের ১৯টি জেলার প্রতিটির জন্য একটি করে তথ্য বই লেখা হচ্ছে যাতে করে জেলার জনগণ স্ব-স্ব জেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে পারবে।

আবু মোস্তফা কামাল উদ্দিন এবং মোঃ সাইদ ইফতেখার যৌথভাবে এই বইটি লিখেছেন। অন্যান্য যারা এই বই লিখতে বিভিন্ন সময়ে সহযোগিতা করেছেন তারা হলেন মহিউদ্দিন আহমদ ও ড. মোঃ লিয়াকত আলী। অক্ষর বিন্যাস ও লে- আউটে সহযোগিতা করেছেন মোঃ নুরুজ্জামান মিয়া।

বইটির পর্যালোচনাসহ মতামত দিয়েছেন পিডিও ও ওয়ারপো-র বিশেষজ্ঞ বৃন্দ। এ ছাড়া ফেনী জেলার বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ মতামত দিয়ে বইটিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

ড. এম. রফিকুল ইসলাম বইটি লিখতে সার্বিক পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জেলাভিত্তিক। ঐতিহ্যগতভাবেই মানুষের জেলাভিত্তিক পরিচয় আছে। অপরদিকে জেলাগুলোরও সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রও জেলা। অন্যদিকে উপকূলীয় জীবনমানের উন্নয়নের জন্য জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার নীতিগত সিদ্ধান্ত উপকূলীয় অঞ্চলের নীতিমালায় রয়েছে।

সমন্বিত উপকূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনার মূল নীতি হল জনগণের অংশগ্রহণে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। উপকূলীয় অঞ্চল উন্নয়নে জেলাভিত্তিক উদ্যোগকে কার্যকর করতে প্রয়োজন জেলার জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ। তাই জেলার জনগণকে তাদের নিজ নিজ জেলার অবস্থা, অবস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদ, সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য জেলাভিত্তিক এই বই লেখা হয়েছে। উপকূলীয় ১৯টি জেলার জন্য আলাদা আলাদা বই লেখা ও প্রচার করা হচ্ছে।

এই বইটি লেখা হয়েছে ফেনী জেলার জনগণকে উন্নয়ন কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট করার জন্য। এতে রয়েছে জেলার প্রাকৃতিক সম্পদের বর্ণনা, ভৌত ও মানব সম্পদের বর্ণনা এবং ভবিষ্যতে এ সম্পদের অবস্থা কি হতে পারে সেই বর্ণনা।

এই বই-এর প্রধান অংশগুলো হচ্ছে 'সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা' এবং 'সম্ভাবনা ও সুযোগ'-এর উপর বিশদ বর্ণনা। এই বর্ণনার তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে অন্যান্য অংশে। তাই জেলার সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলো জেনে নিয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনায় আগ্রহ সৃষ্টি ও অবদান রাখতে এই বই জনগণ তথা উন্নয়ন অংশীদারদের সাহায্য করবে।

তা ছাড়াও 'উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ' আলোচনা এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহায়ক আলোচনায় এই বই সহায়তা করবে বলে আমরা আশা করি।

এই বইয়ের জন্য তথ্য নেয়া হয়েছে প্রধানত বি.বি.এস. - এর বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে। এর পরেই সবচেয়ে বেশি তথ্য এসেছে প্রকল্পের বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে। এ ছাড়াও পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাপিডিয়া, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ আবহাওয়া পরিদপ্তর থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে।

সাহায্য নেয়া হয়েছে ফেনীর উপরে লিখিত বিভিন্ন বই থেকে -

১. আহম্মেদ, জমির, ১৯৯০। ফেনীর ইতিহাস। সমতট প্রকাশনী, চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম, মার্চ, ২০০১।

২. বি.বি.এস., ২০০১। কৃষি শুমারী ১৯৯৬: জেলা সিরিজ ফেনী। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। ঢাকা, জুন, ২০০১।

৩. বি.বি.এস., ১৯৯৩। আদম শুমারী ১৯৯১ : জেলা সিরিজ ফেনী। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। ঢাকা, জুলাই, ১৯৯৩।

৪. ওয়াজেদ, আবদুল, ২০০২। বাংলাদেশের নদীমালা, পালক পাবলিশার্স। ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০২।

৫. CEGIS, 2004. Vulnerability Analysis of Major Livelihood Groups in the Coastal Zone of Bangladesh, Final Report. Centre for Environmental and Geographic Information Services. Dhaka, May 2004.

তথ্য নেয়া হয়েছে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে ফেনী জেলার উপর প্রকাশিত সংবাদ ও নিবন্ধ থেকে।

এ ছাড়াও বইটির পর্যালোচনা ও মূল্যবান তথ্য ও মতামত দিয়েছেন :

- জনাব মোঃ তায়বুল হক, অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, নোয়াখালী সরকারি কলেজ, নোয়াখালী।
- জনাব মোঃ রুহুল আমিন, উপ পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ফেনী।
- জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, রিজিওনাল ম্যানেজার, সুরা, ফেনী।

সূচীপত্র

মুখবন্ধ
জেলা মানচিত্র

সূচনা ১
এক নজরে ফেনী ২
জেলার অবস্থান ৩
উপজেলা তথ্য সারনী ৪

প্রকৃতি ও পরিবেশ ৭
প্রাকৃতিক পরিবেশ ৭
খনিজ সম্পদ ৯
কৃষি সম্পদ ৯
দুর্যোগ ১০
বিপদাপন্নতা ১১

জীবন ও জীবিকা ১৩
জনসংখ্যা ১৩
জনস্বাস্থ্য ১৩
শিক্ষা ১৪
অভিবাসন ১৪
সামাজিক উন্নয়ন ১৪
অর্থনৈতিক অবস্থা ১৪
প্রধান জীবিকা দল ১৫
দারিদ্র্য ১৫

নারীদের অবস্থান ১৭

অবকাঠামো ১৯
রাস্তা-ঘাট ১৯
পোল্ডার ১৯
ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ১৯
সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ১৯
অর্থনৈতিক অবকাঠামো ২০
শিল্প ও বাণিজ্য অবকাঠামো ২০
কৃষি অবকাঠামো ২০
উন্নয়ন প্রকল্প ২১

সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা ২৩
পরিবেশগত সমস্যা ২৩
আইন-শৃঙ্খলাগত সমস্যা ২৪
আর্থ-সামাজিক সমস্যা ২৫

সম্ভাবনা ও সুযোগ ২৭
শিল্প উন্নয়ন ২৮
কৃষি সম্পদ উন্নয়ন ২৭
প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার ও সংরক্ষণ ২৮
অবকাঠামোগত উন্নয়ন ২৮

ভবিষ্যতের রূপরেখা ৩১

দর্শনীয় স্থান ৩৩

জেলা মানচিত্র

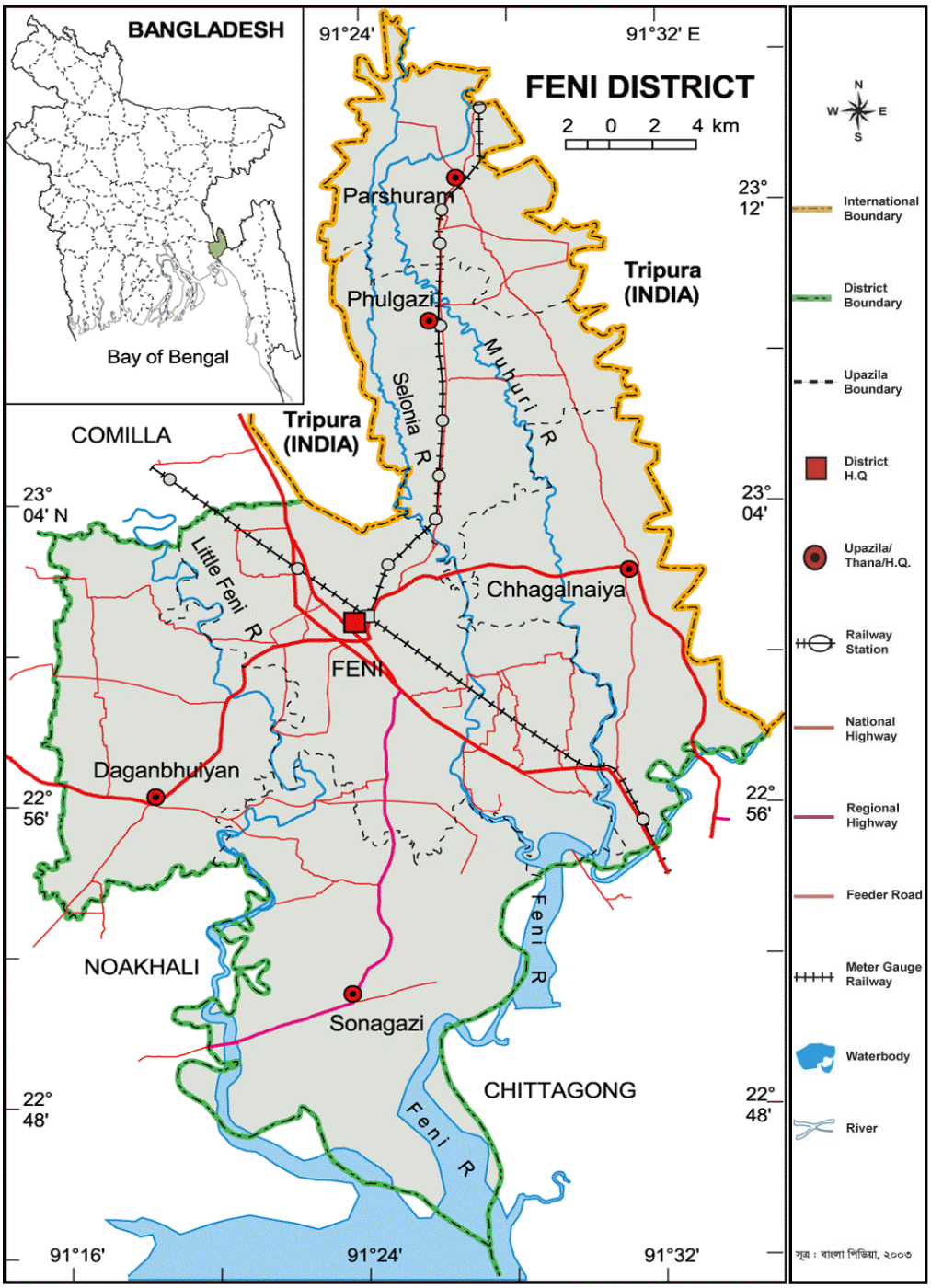

BANGLADESH
Bay of Bengal
FENI DISTRICT
2 0 2 4 km
91°24'
91°32' E
23° 12'
Tripura (INDIA)
Parshuram
Phulgazi
Selonia R
Muhuri R
COMILLA
23° 04' N
23° 04'
Little Feni R
Chhagalnaiya
FENI
Daganbhuiyan
22° 56'
NOAKHALI
Feni R
Sonagazi
CHITTAGONG
22° 48'
91°16'
91°24'
91°32'
N
W
E
S
International Boundary
District Boundary
Upazila Boundary
District H.Q
Upazila/ Thana/H.Q.
Railway Station
National Highway
Regional Highway
Feeder Road
Meter Gauge Railway
Waterbody
River
সূত্র : বাংলা পিডিয়া, ২০০৩

সূচনা

সীমান্ত জেলা ফেনী বাংলাদেশের একটি ক্ষুদ্রতম জেলা। ফেনী জেলা চট্টগ্রাম বিভাগে অবস্থিত। এই জেলার উত্তরে কুমিল্লা এবং ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, পূর্বে চট্টগ্রাম, পশ্চিমে নোয়াখালী এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত।

ফেনী জেলার একটি সমৃদ্ধ ইতিহাস আছে। ধারণা করা হয় ১৪০০ থেকে ১০০০ খ্রীস্টপূর্বে প্রথম এই এলাকায় মানববসতি গড়ে ওঠে। প্রাচীনকালে এই এলাকা সমতট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফেনী জেলা পূর্বে নোয়াখালী জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৭৬ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার প্রশাসনিক সুবিধার জন্য ফেনী মহকুমা প্রতিষ্ঠা করে। পরে ১৯৮৪ সালে ফেনী জেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। ফেনী জেলার নামকরণের দুই-তিন রকম ইতিহাস পাওয়া যায়। এক দলের মতে পুণ্ড্রবর্ধনের রাজা বিরাট -এর জমিদার ফনী রাজা, যার উপর এই এলাকার শাসনভার ন্যস্ত ছিল তার নামানুসারে এই এলাকার নামকরণ হয়েছে। আরেকটি মত অনুসারে ফেনীর নীচু এলাকা এক সময় প্রচুর কচুরীপানা (স্থানীয়ভাবে 'পেনা' নামে পরিচিত) দ্বারা আবৃত ছিল। পেনা থেকেও এই এলাকার নামকরণ হতে পারে। আবার এই এলাকা একসময় সাপের (স্থানীয় শব্দ ফেনী) আবাসস্থল ছিল। সাপের হাত থেকে মুক্তি পেতে লোকজন প্রচুর ফনী মন্‌সা গাছ লাগাতো। এ থেকেও এই জেলার নামকরণ হতে পারে। আবার ফেনী নদীর (যেটি সাপের মতো সর্পিলাকার গতিতে ফেনী জেলার উপর দিয়ে বয়ে গেছে) নামানুসারেও ফেনী জেলার নামকরণ হতে পারে।

এই জেলার মোট আয়তন ৯২৮ বর্গ কি. মি., যা সমগ্র বাংলাদেশের আয়তনের ০.৬৩%। জেলার মোট লোকসংখ্যা ১২.০৬ লাখ। আয়তনের দিক থেকে উপকূলীয় জেলাগুলোর মধ্যে এই জেলার অবস্থান ১৮তম এবং জনসংখ্যার দিক দিয়ে এই জেলা উপকূলীয় জেলাগুলোর মধ্যে ১৩ তম।

৫টি উপজেলা, ২টি পৌরসভা, ৬৪টি ইউনিয়ন/ওয়ার্ড, ৫৯১টি মৌজা/মহল্লা ও ৫৭১টি গ্রাম নিয়ে ফেনী জেলা গঠিত। ফেনী সদর, ছাগলনাইয়া, দাগনভূইয়া, পরশুরাম, সোনাগাজী জেলার ৫টি উপজেলা। উপজেলাগুলোর মধ্যে সোনাগাজীর আয়তন সবচেয়ে বড়। যদিও ফেনী সদর উপজেলায় সবচেয়ে বেশি লোক বাস করে।

উপজেলা	**৫ টি**
পৌরসভা	**২ টি**
ইউনিয়ন/ওয়ার্ড	**৬৪ টি**
মৌজা/মহল্লা	**৫৯১** টি
গ্রাম	**৫৭১** টি

প্রাকৃতিক প্রভাব ও ভৌগোলিক অবস্থানের উপর ভিত্তি করে উপকূলীয় এলাকাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন তীরবর্তী (Exposed Coast) এবং অন্তর্বর্তী (Interior Coast) উপকূলীয় এলাকা। এই জেলার উপজেলাগুলোর মাটি, ভূ-গর্ভস্থ পানি ও ভূ-উপরিভাগের পানিতে কতটুকু লবণাক্ততা আছে এবং সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাসের ঝুঁকি কতটুকু -তার ওপর ভিত্তি করে ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলাকে তীরবর্তী (Exposed Coast) উপকূলীয় এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এক নজরে ফেনী

	বিষয়	একক	ফেনী	উপকূলীয় অঞ্চল	বাংলাদেশ	তথ্য সূত্র ও বছর
এলাকা / প্রশাসনিক	এলাকা	বর্গ কি.মি.	৯২৮	৪৭,২০১	১,৪৭,৫৭০	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	উপজেলা	সংখ্যা	৫	১৪৭	৫০৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	ইউনিয়ন	সংখ্যা	৪৫	১,৩৫১	৪,৪৮৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পৌরসভা	সংখ্যা	২	৭০	২২৩	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	ওয়ার্ড	সংখ্যা	১৯	৭৪৩	২,৪০৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	মৌজা / মহল্লা	সংখ্যা	৫৯১	১৪,৬৩৬	৬৭,০৯৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গ্রাম	সংখ্যা	৫৭১	১৭,৬১৮	৮৭,৯২৮	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যা	লাখ	১২.০৬	৩৫০.৭৮	১২৩৮.৫১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	লাখ	৫.৯৩	১৭৯.৪২	৬৩৮.৯৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	লাখ	৬.১৩	১৭১.৩৫	৫৯৯.৫৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	জনসংখ্যার ঘনত্ব	বর্গ কি.মি.	১,৩০০	৭৪৩	৮৩৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	লিঙ্গ অনুপাত	অনুপাত	৯৭	১০৫	১০৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গৃহস্থালির আকার	গৃহ প্রতি জনসংখ্যা	৫.৭	৫.১	৪.৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গৃহস্থালির মোট সংখ্যা	লাখ	২.১৩	৬৮.৪৯	২৫৩.০৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী প্রধান গৃহ	গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	৩.২২	৩.৪৪	৩.৫	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
ভৌত অবকাঠামো	টেকসই দেয়ালসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	২১	৪৭	৪২	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
	টেকসই ছাদসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৬৯	৫০	৫৪	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
	বিদ্যুৎ সংযোগসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৪৭	৩১	৩১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	প্রাথমিক স্কুল	সংখ্যা / ১০,০০০ জন	৬	৭	৬	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
	রাস্তার ঘনত্ব	কি.মি./বর্গ কি.মি.	১.৫২	০.৭৬	০.৭২	বিশ্ব ব্যাংক, ১৯৯৬ ও বি.বি.এস.,২০০৩
	বাজারের ঘনত্ব	বর্গ কি.মি. / সংখ্যা	৪৬	৮০	৭০	১৯৯৬ (বিশ্ব ব্যাংক, ১৯৯৬)
অর্থনীতি	মোট আয়	কোটি টাকা	১,৭০৫	৬৭,৮৮০	২,৩৭,০৭৪	১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২)
	মাথাপিছু আয়	টাকা	১২,৬৬১	১৮,১৯৮	১৮,২৬৯	১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২)
	কর্মক্ষম শ্রম শক্তি (১৫ বছর+)	হাজার	৪৮২	১৭,৪১৮	৫৩,৫১৪	১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২)
	কর্মরত নারী (খাদ্য বা অর্থের বিনিময়ে)	% (১৫-৪৯ বয়সদল)	২২	২৬	২৮	২০০১ (নির্পেটি, ২০০৩)
	কৃষি শ্রমিক	গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	১২	৩৩	৩৬	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	জেলে	গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	১৯	১৪	৮	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ	হেক্টর	০.১৩	০.০৬	০.০৭	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	দারিদ্র	মোট গৃহস্থের (%)	৫৪	৫২	৪৯	১৯৯৮(বি.বি.এস.,২০০২)
	অতি দারিদ্র	মোট গৃহস্থের (%)	২০	২৪	২৩	১৯৯৮(বি.বি.এস.,২০০২)
শিক্ষা	প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির হার	৬-১০ বছর শিশু(%)	১০৬	৯৫	৯৭	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
	সাক্ষরতার হার, ৭ বছর+	মোট জনসংখ্যা (%)	৫৩	৫১	৪৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	%	৫৭	৫৪	৫০	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	%	৫০	৪৭	৪১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	সাক্ষরতার হার, ১৫ বছর+	মোট জনসংখ্যা (%)	৫৮	৫৭	৪৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	%	৬৪	৬১	৫৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	%	৫২	৪৯	৪১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
স্বাস্থ্য	গ্রামীণ পানি সরবরাহ (সক্রিয় টিউবওয়েল)	প্রতি গড় জনসংখ্যা	৮৭	১১১	১১৫	২০০২ (ডি.পি.এইচ.ই, ২০০৩)
	কল অথবা নলকূপের পানির সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৯১	৮৮	৯১	২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৬৪	৪৬	৩৭	২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	হাসপাতালের শয্যাপ্রতি জনসংখ্যা (সরকারি)	জন / শয্যা	৫.১৪১	৪,৬৩৭	৪,২৭৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নবজাতক মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে	৯৮	৮০-১০৩	৯০	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	<৫ বছর শিশু মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে	৬৮	৫১-৬৮	৪৩	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	অতি অপুষ্টির হার	%	৬	৬	৬	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	ছেলে	%	৬	৪	৪	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	মেয়ে	%	৬	৮	৬	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	মাতৃ মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে	৪	৫	৫	১৯৯৮/৯৯ (স্বাস্থসেবা অধিদপ্তর, ২০০০)
	আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রন পদ্ধতি গ্রহণকারী নারী	%	৩৯	৪১	৪৪	২০০১ (নির্পেটি, ২০০৩)

জেলার অবস্থান

জাতীয় অবস্থার তুলনায় ভাল দিক

- রাস্তার ঘনত্ব (১.৫২ কি. মি,/ বর্গ কি. মি.), জাতীয় (০.৭২ কি. মি./বর্গ কি. মি.) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (০.৭৬ কি. মি./ বর্গ কি. মি.) চেয়ে অনেক বেশি ।
- সাক্ষরতার হার (৭^{+} বছর) ৫৩%, যা উপকূলীয় অঞ্চলের (৫১%) ও জাতীয় হারের (৪৫%) তুলনায় অনেক বেশি ।
- জেলার মোট গৃহের ৯১% কল বা নলকূপের পানির সুবিধাপ্রাপ্ত, যা জাতীয় (৯১%) হারের সমান ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৮৮%) হারের তুলনায় বেশি ।
- জেলার ৬৪% গৃহে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধা আছে, যা জাতীয় হারের (৩৭%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের হারের (৪৬%) চেয়ে অনেক বেশি।
- জেলার অতি দরিদ্র (২০%) গৃহস্থালির সংখ্যা জাতীয় (২৩%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (২৪%) হারের তুলনায় কম।
- জেলায় ৪৭% গৃহে বিদ্যুৎ সংযোগ আছে, যা জাতীয় (৩১%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৩১%) তুলনায় বেশি।
- জেলার গড়ে ৪৬ বর্গ কি. মি. এলাকায় একটি হাট-বাজার কেন্দ্র আছে, যা জাতীয় (৭০ বর্গ কি. মি. এ একটি) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৮০ বর্গ কি. মি. এ একটি) তুলনায় অনেক কম।
- মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৪ জন, যা জাতীয় (৫ জন) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৫ জন) তুলনায় কম ।

জাতীয় অবস্থার তুলনায় দুর্বল দিক

- ফেনী জেলার মাথাপিছু আয় (১২,৬৬১ টাকা) সমস্ত উপকূলীয় জেলাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম এবং জাতীয় (১৮,২৬৯ টাকা) ও উপকূলীয় অঞ্চলের গড় আয়ের (১৮,১৯৮ টাকা) তুলনায় অনেক কম।
- জেলার দরিদ্রপীড়িত (৫৪%) গৃহস্থালির সংখ্যা জাতীয় (৪৯%) ও উপকূলীয় অঞ্চল (৫২%) হারের তুলনায় বেশি।
- জেলার নবজাতক মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে ৬৮) সমস্ত উপকূলীয় জেলাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ও জাতীয় (প্রতি হাজারে ৪৩) হারের তুলনায় অনেক বেশি।
- জেলার বার্ষিক আয় প্রবৃদ্ধির হার (৪.৯%) জাতীয় ও উপকূলীয় অঞ্চলের হারের (৫.৪%) চেয়ে অনেক কম।
- ক্ষুদ্র কৃষকদের সংখ্যা (৬২%) জাতীয় (৫৩%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৫৮%) তুলনায় বেশি।
- মধ্যম মাত্রার লিঙ্গীয় অসমতা।
- জেলার মোট আয়ে শিল্পখাতের অবদান ২০%, যা জাতীয় (২৫%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (২২%) হারের তুলনায় কম।
- জেলার ভূমিহীনদের সংখ্যা (৫৪%) জাতীয় হারের তুলনায় বেশি (৫৩%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৫৪%) সমান।
- হাসপাতালে শয্যা প্রতি জনসংখ্যা ৫,১৪১ জন, যা জাতীয় (৪,২৭৬) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৪,৬৩৭) তুলনায় অনেক বেশি।
- জেলায় শহুরে জনসংখ্যার ভাগ (১১%) জাতীয় ও উপকূলীয় অঞ্চলের (২৩%) তুলনায় অনেক কম।
- জেলায় ১৩-৪৯ বয়স দলের নারীদের মধ্যে আধুনিক জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার ৩৯%, যা জাতীয় (৪৪%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৪১%) হারের তুলনায় কম।

উপজেলা তথ্য সারণী

বিষয়		একক	ফেনী	উপজেলা		
				সদর	ছাগলনাইয়া	দাগনভূইয়া
এলাকা/ প্রশাসনিক	এলাকা	বর্গ কি.মি.	৯২৮	১৯৭	১৩৩	১৬৬
	ইউনিয়ন / ওয়ার্ড	সংখ্যা	৬৪	৩০	৬	৯
	মৌজা / মহল্লা	সংখ্যা	৫৯১	১৬৮	৫৪	১১৮
	গ্রাম	সংখ্যা	৫৭১	১২৫	৬৬	১১৮
জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যা	লাখ	১২.০৬	০.৪১	১.৬৫	২.০২
	পুরুষ	লাখ	৫.৯৩	২.০১	০.৮০	০.৯৯
	নারী	লাখ	৬.১৩	২.০৫	০.৮৫	১.০৪
	জনসংখ্যার ঘনত্ব	জন/বর্গ কি.মি.	১,৩০০	২,০৫৭	১,২৩৫	১,২২১
	নারী পুরুষের অনুপাত	অনুপাত	৯৭	৯৮	৯৪	৯৫
	গৃহস্থালির মোট সংখ্যা	লাখ	২.১৩	০.৬৯	০.৩০	০.৩৮
	গৃহস্থালির আকার	জন/গৃহস্থালি	৫.৭	৫.৯০	৫.৫৯	৫.৩১
	নারী প্রধান গৃহ	মোট গ্রামীণ গৃহস্থের %	৩.২২	৪.৪	৪.৫	৪.৩
ভৌত অবকাঠামো	টেকসই দেয়ালসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	২১	তথ্য নাই	৪০	২০
	টেকসই ছাদসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৬৯	৭৬	৭৮	৬৬
	বিদ্যুৎ সংযোগসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	১৪	২২	২০	১১
	প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	৭১৪	১৯৬	১১৮	১৩১
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	১৭৪	৫৬	২৯	২৭
	মহাবিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	২১	৫	৫	২
অর্থনীতি	কৃষি শ্রমিক	মোট গ্রামীণ গৃহস্থের %	১২	১৫	১২	২৫
	কৃষি প্রধান পরিবার	মোট গ্রামীণ গৃহস্থের %	৬৯	৬৮	৬৯	৭১
	অকৃষি প্রধান পরিবার	মোট গ্রামীণ গৃহস্থের %	৩১	৩২	৩১	২৯
	মোট চাষের জমি	হেক্টর	৪৯,৪৭৩	১০,৪৬৪	৭,৭৮১	৮,৭৭৪
	এক ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	১৭	৭	১৫	০
	দো ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	৬৯	৮৪	৭৪	৭১
	তিন ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	১৪	৯	১১	২৯
	প্রতি ০.০১ হেক্টর জমির মূল্য	টাকা	১২,০০০	১০,০০০	২,৫০০	১২,৫০০
শিক্ষা	সাক্ষরতার হার (৭ বছর$^{+}$)	%	৫৩	৫২	৬৩	৫৩
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার	৬-১০ বছর শিশু (%)	১০৬	১০৭	১২৯	১০০
	মেয়ে	৬-১০ বছর শিশু (%)	১০৭	১১০	১১২	১০৮
স্বাস্থ্য	সক্রিয় টিউবওয়েল	সংখ্যা	১৩,৮০৮	৩,১২৯	২,২৭৩	২,১০৬
	কল অথবা নলকূপের পানির সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৯০	৯৩	৮৯	৮৯
	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	১৪	১৯	১১	১৫

উপজেলা		তথ্য সূত্র ও বছর
পরশুরাম	সোনাগাজী	
১৯৭	২৩৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১০	৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১৫৭	৯৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১৬৮	৯৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১.৯৮	২.৩৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১.০০	১.১৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
০.৯৮	১.২১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১,০০৭	৯৯৮	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১০২	৯৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
০.৩৫	০.৪১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
৫.৬০	৫.৬৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
৫.৯	৪.৭	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
৩৫	১৪	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
৬৫	৫৬	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
৭	৬	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
১২৬	১৪৩	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
৩৯	২৩	২০০২ (ব্যানবেইস, ২০০৩)
৭	২	২০০২ (ব্যানবেইস, ২০০৩)
১৬	২৬	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
৭১	৬৭	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
২৯	৩৩	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
৪,৭৭০	১০,২৮১	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
২১	৫৬	২০০৩ (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩)
৭৩	৩০	২০০৩ (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩)
৬	১৪	২০০৩ (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩)
৬,৫০০	২৫,০০০	২০০৩ (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩)
৫৫	৪৮	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
৯৬	১০১	২০০১(প্রা.শি.অ)
১০৩	১০৩	২০০১(প্রা.শি.অ)
৩,২২৬	৩,০৭৪	২০০২ (ডি.পি.এইচ.ই, ২০০৩)
৯১	৮৪	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
১১	৯	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)

প্রকৃতি ও পরিবেশ

একদিকে সাগর ও নদীর প্রভাব, চর ও নতুন জমি, বনাঞ্চল এবং অন্যদিকে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদী ভাঙ্গন - এসবই ফেনী জেলার প্রকৃতি ও পরিবেশকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ

জলবায়ু	**সমভাবাপন্ন**
তাপমাত্রা	**২২° সেঃ - ৩০° সেঃ**
আপেক্ষিক আর্দ্রতা	**৭৯% - ৯০%**
বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত	**প্রায় ২,৬০০ মিঃ মিঃ**

জলবায়ুঃ দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের অবস্থানের জন্য এই জেলার জলবায়ু সমভাবাপন্ন। বাতাসে উচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতা আছে। এই জেলার তাপমাত্রা সমভাবাপন্ন এবং জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসে প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়। বার্ষিক গড় তাপমাত্রা সাধারণত ২২.২° সে. থেকে ৩০.৫° সে. এর মধ্যে থাকে। জানুয়ারিতে আপেক্ষিক আর্দ্রতা থাকে প্রায় ৭৯%, যা জুলাই মাসে বেড়ে প্রায় ৯০% হয়। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ২,৬০০ মি. মি.।

নদী ও মোহনা : এই জেলার প্রধান নদীগুলো হচ্ছে ফেনী, মুহুরী সেলোনিয়া এবং ঘুরিয়াচর। এই নদীগুলোয় সারা বছরই পানি থাকে এবং নৌ চলাচলের উপযুক্ত থাকে। এদের মধ্যে ফেনী নদী ভারত ও বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডকে আলাদা করেছে। সব মিলিয়ে নদ-নদীগুলো প্রায় ৬০ বর্গ কি.মি. এলাকা জুড়ে আছে, যা জেলার আয়তনের ৬%।

ফেনী নদী : ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের পর্বতশ্রেণী থেকে উদ্ভব হয়ে ফেনী নদী ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য এবং বাংলাদেশের ফেনী, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এই নদী চট্টগ্রাম, নোয়াখালী এবং ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সীমানা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। উৎস থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত নদীটি ১১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ। বর্ষাকালে নদীর তীব্র স্রোত ও ঘূর্ণি ভয়ংকর রূপ ধারণ করে।

মুহুরী নদী : ভারতের পার্বত্য ত্রিপুরার লুসাই পাহাড়ে মুহুরী নদীর উৎপত্তি। ভারতীয় পাহাড়ি অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ফেনীর পরশুরাম উপজেলার নীলজ কালিকাপুর এবং ফকিরখীল গ্রামের কাছে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। নদীটি খরস্রোতা, ভীষণভাবে একেবেঁকে প্রবাহিত। অনেকখানি এলাকা জুড়ে এই নদীটির এপারে বাংলাদেশ অপর পারে ভারত অর্থাৎ ত্রিপুরা রাজ্য। নদীটিকে ফ্লাসি নদী (Flashy) বলা হয়, অর্থাৎ এ নদীতে আকস্মিক বন্যা দেখা দেয়। যেহেতু পাহাড়ি নদী; বৃষ্টি হলেই হঠাৎ করে নদীর পানি ফুলে উঠে এবং সমতল এলাকার দু'কূল উপচিয়ে বন্যার সৃষ্টি করে।

মুহুরী নদীটি বেশি চওড়া নয়। প্রস্থে মাত্র ১৫০/২০০ মিটার (৫০০-৬৫০ ফুট) এবং খুব গভীরও নয়। শুকনার দিনে বিশেষ করে শীতের সময় মানুষ হেঁটেই এপার ওপার করতে পারে। তবে যতই সাগরের দিকে প্রবাহিত হয়ে এগিয়ে গেছে ততই চওড়া হয়েছে। বঙ্গোপসাগরের কাছে অর্থাৎ মোহনায় মুহুরী নদীর এই পারে চট্টগ্রাম অন্য পারে ফেনী/নোয়াখালী। মুহুরী নদী দু'জেলার সীমারেখা হিসেবে গণ্য হচ্ছে এবং এই এলাকায় জোয়ার-ভাটা রীতিমত চলে।

ছোট ফেনী : ছোট ফেনী ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের পর্বত শ্রেণী থেকে উদ্ভব হয়ে ফেনী'র নিকট বাংলাদেশে প্রবেশ করে।

মাটি : জেলার মাটি প্রধানত পুরাতন ব্রহ্মপুত্র পললভূমি দ্বারা গঠিত। মাটি জলপাই বা ধূসর রঙের দোঁয়াশ অথবা বেলে-দোঁয়াশ মাটি। জেলার উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত টিলাপূর্ণ এলাকার মাটি বাদামী রঙের এবং তীব্র অম্লীয়। আবার

জেলার দক্ষিণাঞ্চলের মাটি মেঘনা নদী দ্বারা প্রভাবিত। এই জেলায় দু'ধরনের ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চল দেখা যায়। পুরাতন মেঘনা মোহনা পললভূমি এবং নতুন মেঘনা মোহনা পললভূমি। মাটি কিছু পরিমাণ লবণাক্ত। জেলায় সর্বোচ্চ ১৫ পি.পি.এম. লবণাক্ততা দেখা যায়, যা এলাকার ফসলের প্রকৃতি ও উৎপাদনে প্রভাব বিস্তার করে।

সাগর : জেলার দক্ষিণে অবস্থিত বঙ্গোপসাগর ভূ-প্রকৃতি ও মানুষের জীবন জীবিকাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। সাগরের প্রভাবের উপর ভিত্তি করেই এই জেলায় ব্যপক ম্যানগ্রোভ বনায়ন করা হয়েছে। বিচিত্র ধরনের জীব ও সম্পদের সমাবেশ সাগরের লোনা পানি ও বেলাভূমিতে। জেলার অনেক মানুষই এ সম্পদ আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন।

বনভূমি : জেলার বনভূমির মোট পরিমাণ ৮৮৬ হেক্টর। এর বেশিরভাগই বঙ্গোপসাগরের তীরে সৃজিত ম্যানগ্রোভ বন (বি.বি.এস. ২০০১)। ফেনী জেলায় বর্তমানে প্রাকৃতিক কোন বন না থাকলেও বন বিভাগের চেষ্টায় ও স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণে বিপুল পরিমাণ এলাকায় বনায়ন করা হয়েছে। ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ের পরে প্রাণহানি ও ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ লক্ষ্য করেন যে, যেসব এলাকায় গাছপালার আচ্ছাদন ছিল, সেসব এলাকায় ক্ষয়ক্ষতি অনেক কম হয়েছে। তাই এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় উপকূলীয় সবুজবেষ্টনি প্রকল্পের আওতাধীনে জেলার সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলগুলোতে বনায়নের মাধ্যমে সবুজবেষ্টনি সৃজন করা হয়। এ বন একদিকে যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে লোকজনকে রক্ষা করে, অপরদিকে মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদেরও জোগান দেয়।

উদ্ভিদ ও প্রাণী বৈচিত্র্য : জেলার জলবায়ু ও মাটির ধরন এখানকার উদ্ভিদ ও জীব জগতে বৈচিত্র্য এনেছে। জেলার উদ্ভিদ ও প্রাণী বৈচিত্র্যের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নীচে দেয়া হলো।

উদ্ভিদ : ফেনী বঙ্গোপসাগরের তীর ঘেসে অবস্থিত এমন একটি জেলা যেখানে প্রচুর পরিমাণ এলাকা মুহুরী নদীবাহিত পলি দ্বারা গঠিত। তাই, এখানে গাছপালায় গাঙ্গেয় পলল ভূমির বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এখানে প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই প্রচুর পরিমাণ গাছপালা আছে।

বাড়িতে জন্মানো গাছের মধ্যে আম, গাব, জাম, তাল, তেঁতুল, কাঁঠাল, জলপাই, বেল, চালতা, বরই, পেয়ারা, লিচু, কামরাঙ্গা, আতা, হরিতকি, আমলকি অন্যতম। এ ছাড়া প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই বাদাম ও কলাগাছ দেখা যায়। স্থানীয় গাছের মধ্যে কড়ই, শাল কড়ই, গর্জন, জারুল, শিমূল অন্যতম। এ ছাড়াও বিভিন্ন জাতের বিদেশী গাছ যেমন টিক, মেহগনি, শিশু রাস্তার পাশে ও বাড়িতে লাগানো হয়ে থাকে। প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই মান্দার নামের এক প্রকার কাঁটাওয়ালা গাছ বেড়া ও জ্বালানির জন্য লাগানো হয়। বর্তমানে ইউক্যালিপটাস ও পাইন গাছও লাগানো হচ্ছে।

এই জেলায় পাম জাতীয় গাছ প্রচুর জন্মে থাকে। জেলার উত্তরে ও পশ্চিমে সুপারি গাছ প্রচুর জন্মে। নারিকেল গাছ সারা জেলায়ই জন্মে। তাল ও খেজুর গাছ বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। এই জেলায় বিভিন্ন জাতের বেত, বাঁশ ও ছন জন্মে। জলা এলাকার সোলা ও শীতলপাটি দেখা যায়, যা বিভিন্ন প্রকার মাদুর ও ঝুড়ি তৈরীতে ব্যবহৃত হয়।

প্রাণী : অনুকূল পরিবেশ ও প্রাকৃতিক বনের অভাবে এই জেলায় কোন বড় বা মাঝারি ধরনের মাংসাশী প্রাণী দেখা যায় না। তবে শিয়াল, খেঁকশিয়াল, বাগডাসা, উদবিড়াল, কাঠবিড়াল, বেজী, বিভিন্ন প্রকার ইঁদুর ও বাঁদুড় দেখা যায়। যদিও এদের অনেকগুলোই আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

সারা দেশের মতো এখানেও প্রায় সব ধরনের পাখিই দেখা যায়, যাদের মধ্যে শকুন, বাজ, গাংচিল, চিল, কানি বগা, গো বগা, কালা বগা, কাক, মাছরাঙ্গা অন্যতম। বিভিন্ন প্রজাতির হাঁস আছে। এ ছাড়াও জলচর পাখী যেমন পানকৌড়ি, ডাহুক, কোরা, পিটালি, রাজহাঁস অন্যতম। এদের পাশাপাশি এই জেলায় দোয়েল, কোকিল, হলদে

পাখী, ফিঙ্গে, ময়না, শালিক, বুলবুল, টুনটুনি, শ্যামা, বাবুই, কবুতর ও ঘুঘু দেখা যায়। শীতকালে এই জেলায় প্রচুর অতিথি পাখী আসে।

বিভিন্ন প্রজাতির সামুদ্রিক ও মিঠা পানির মাছও এই জেলায় পাওয়া যায়। জনপ্রিয় মাছগুলো হল রুই, কাতল, মৃগেল, কালবাউশ, আইড়, টেংরা, মাগুর, শিং, শোল, বোয়াল, গজাড়, পাবদা, কই, মুড়লা, পুটি, বাইন এবং চেলা। এদের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকার কার্প জাতীয় মাছ, তেলাপিয়া, নাইলোটিকা পুকুর ও দীঘিতে চাষ করা হয়।

সাগরে রয়েছে অফুরাণ জীব বৈচিত্র্য। বিভিন্ন প্রজাতির মাছ যেমন রূপালী ও সাদা রূপচান্দা, লইট্যা, ছুরি, পোয়া, সাদা দাতিনা, তুল্লার ডাডি, বাটা, ফানসা, গুইচ্চা, ভেটকি, লাল পোয়া, চাপাকড়ি, চম্পা, সারডিন, বম মাইট্টা ও বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ি যেমন বাগদা, বাঘতারা, ডোরাকাটা, চাগা, বাঘাচামা, ইরিনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া সাগর পাড়ের অগভীর জলে রয়েছে নানা প্রজাতির জীব যেমন, শামুক, ঝিনুক, কস্তুরা বা ওয়েস্টার, কাঁকড়া, লবষ্টার, শৈবাল বা সী উইড, সামুদ্রিক শসা, শিরোপদী। এ ছাড়া, সাগর উপকূলে নানা প্রজাতির স্পঞ্জ, জেলী মাছ ও প্রবাল আছে।

খনিজ সম্পদ

ফেনী জেলা প্রাকৃতিক গ্যাসে সমৃদ্ধ। ফেনীতে ১৯৮১ সালে প্রথম গ্যাস ফিল্ড আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু ১৯৯৬ সালে গ্যাস শুকিয়ে যাওয়ায় কূপগুলো পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে বেশকিছু অনুসন্ধানের পর জানা গেছে যে, এক্ষেত্রে এখনো ৫০ বিলিয়ন কিউবিক ফুটের অধিক গ্যাস মজুত আছে। আশা করা যাচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি পুনরায় গ্যাস উত্তোলন শুরু হবে। বর্তমানে এ জেলায় গ্যাস অনুসন্ধান করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন জরীপ থেকে জানা গেছে যে গ্যাস পাওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল। Niko Resouce Limited, BAPEX এর সাথে Joint Venture এর ফেনী গ্যাস ক্ষেত্র থেকে গ্যাস উত্তোলনের পদক্ষেপ নিয়েছে।

আবিষ্কারের সময়	১৯৮১
গ্যাসের মজুদ	১৬৫ বিলিয়ন কিউবিক ফুট
আহরনযোগ্য গ্যাসের মজুদ	৭৬.৫ বিলিয়ন কিউবিক ফুট

কৃষি সম্পদ

কৃষি জমি : জেলার অর্থনীতিতে কৃষিকাজের গুরুত্ব অপরিসীম। কৃষি শুমারী (১৯৯৬) থেকে দেখা যায় যে, প্রায় ৮০ হাজার হেক্টর জমিতে কৃষিকাজ করা হয়ে থাকে, যা সমগ্র জেলার ৯৩%। কৃষি শুমারী (১৯৯৬) থেকে দেখা যায় যে, মোট আবাদকৃত জমির ২৬.৩% উঁচু জমি, ৬২.৫% জমি মাঝারি এবং ৮.১% নীচু জমি। জেলার অধিকাংশ এলাকায় মাঝারি ও নিচু জমিতে বর্ষাকালে পানি জমে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

প্রধান ফসল : জেলার প্রধান ফসল ধান (প্রায় ৯৩% কৃষি জমিতে ধান চাষ করা হয়ে থাকে)। ৩৪% জমিতে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান চাষ করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া অন্যান্য অর্থকরী ফসলের মধ্যে আলু, সবজি, বাদাম, পাট, বিভিন্ন প্রকার ডাল, বিভিন্ন প্রকার সবজি ও তেল বীজ অন্যতম। সামগ্রিকভাবে শস্য নিবিড়তার মান ২০৩, যা উপকূল অঞ্চলের গড় ও বাংলাদেশের শস্য নিবিড়তার তুলনায় অনেক বেশি ।

কৃষি জমির ব্যবহার	
উচ্চ ফলনশীল জাতের আউশ	৬%
উচ্চ ফলনশীল জাতের আমন	১৩%
উচ্চ ফলনশীল জাতের বোরো	১৫%
স্থানীয় জাতের ধান	৫৯%
আলু	১%
সবজি	১%
মসলা	২%
ডাল	৩%
তেলবীজ	১%

পশু সম্পদ : ফেনীতে ৪৫% গ্রামীণ বাড়িতে গবাদিপশু আছে এবং বাড়ি প্রতি গবাদিপশুর পরিমাণ গড়ে ২.১১। এই হার উপকূলীয় গড়ের চেয়ে কম।

মৎস্য সম্পদ : ফেনীতে অভ্যন্তরীণ নদ-নদী ও পুকুর থেকে প্রচুর পরিমাণ মাছ ধরা হয়, যা একদিকে যেমন লোকের খাদ্যের মান বজায় রাখতে সাহায্য করে তেমনি জেলার অর্থনীতিতেও অবদান রাখে। ২০০১-০২ সালের হিসাবে দেখা যায় যে, জেলার নদ-নদী, মোহনা ও জলাভূমি থেকে প্রায় ৫ হাজার মেট্রিক টন মাছ ধরা হয়েছে, যা উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় ২%।

মাছ চাষ : ২০০১-০২ সালের হিসাব থেকে দেখা যায় যে, জেলার পুকুরগুলো থেকে প্রায় ১১ হাজার মে. টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে (উপকূলের প্রায় ৪%)। ফেনী জেলার প্রায় ৭০% পুকুরে মাছ চাষ করা হয়ে থাকে এবং হেক্টর প্রতি মাছের উৎপাদন ৩.৪ মেট্রিক টন। আবার পরিত্যক্ত ও চাষযোগ্য পুকুরের পরিমাণ ৩০%, যেখানে মাছের গড় উৎপাদন বছরে ১.৭০ মে.টি./হে.। যদি সংস্কারযোগ্য পুকুরগুলোকে মাছ চাষের আওতায় আনা যায় তবে উৎপাদনের পরিমাণ আরো বাড়বে। এ ছাড়াও অনেক লোক সামুদ্রিক মাছ ধরেও জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। ফেনী জেলায় বর্তমানে প্রায় ৫ হেক্টর জমিতে চিংড়ি চাষ করা হয়।

দুর্যোগ

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস: উপকূলীয় জনপদ ফেনীকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের লীলাভূমি বলা চলে। মোগল আমলের বিশিষ্ট পণ্ডিত ও ঐতিহাসিক আবুল ফজলের রচিত 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে বাংলার উপকূলে ব্যাপক জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণ পাওয়া যায়। আবার ব্রিটিশ রাজত্বের গোড়ার দিকে ১৬৮৪ সালে এক জলোচ্ছ্বাস বরিশাল থেকে চট্টগ্রাম অঞ্চল পর্যন্ত ডুবে গিয়েছিল। সেই সঙ্গে হয়েছিল ভয়ংকর এক ঘূর্ণিঝড়। ১৭৭০ সালে বাংলার উপকূলে এক ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হয়। ঐ প্রাকৃতিক দুর্যোগ তথা সাগরের জলোচ্ছ্বাসে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী বরিশালের বিরাট এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঐ দুর্যোগের ফলে বহু লোক প্রাণ হারায় ও উপকূলের কিছু অংশ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। দেশী-বিদেশীদের কল-কারখানা সমৃদ্ধ ফেনী জেলার জুগিদিয়া নামক জনপদ এই সময় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ১৭৮৪ সালে বর্ষাকালে পুনরায় জলোচ্ছ্বাস ও প্লাবন হয়। ১৮২২, ১৮২৫ এবং ১৮৪৮ সালের জলোচ্ছ্বাসে উপকূলীয় অঞ্চল লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। মানুষ একদিকে যেমন ভূমিহীন, গৃহহীন হয়ে পড়ে তেমনি আয়ের অবলম্বন চরাঞ্চলের লবণ খামার, গাছ-গাছালী, নারিকেল, সুপারি, তালগাছ, খেজুর গাছ বিলীন হয়ে যায়। এ ছাড়াও ১৮৬৭, ১৮৭৬, ১৮৯৩, ১৮৯৫, ১৮৯৭, ১৮৯৮, ১৯০১, ১৯১৭, ১৯২২, ১৯২৩, ১৯২৬, ১৯৪১, ১৯৪৮, ১৯৫০, ১৯৫৭, ১৯৫৮, ১৯৬০, ১৯৬১, ১৯৬৩, ১৯৬৫, ১৯৭০ সালে ব্যাপক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস সংগঠিত হয়।

ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থানের জন্য ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলা ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের দ্বারা বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে। বঙ্গোপসাগরে প্রধানত দুটি ভিন্ন প্রকারের সাইক্লোন হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে গ্রীষ্মমন্ডলীয় সাইক্লোন ও অপরটি হচ্ছে মৌসুমী নিম্নচাপ। সাইক্লোনের সময় বাতাসের গতিবেগ প্রতি ঘন্টায় সর্বোচ্চ ২৪০ কি.মি. পর্যন্ত উঠতে পারে। এর সাথে ৬ থেকে ৭ মিটার উচ্চতার জলোচ্ছ্বাস এবং তীব্র বৃষ্টিপাতও দেখা যায়।

আকস্মিক বন্যা ও পাহাড়ি ঢল : ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ে সৃষ্ট ঢল ফেনী জেলায় আকস্মিক বন্যার সৃষ্টি করে। জেলার ছাগলনাইয়া, পরশুরাম ও ফুলগাজী উপজেলা বন্যা দ্বারা বেশি আক্রান্ত হয়। প্রবল বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলের ফলে নদীর দু'পাশের পানি উপচে পরে ফসলের জমি ও বীজতলা ডুবিয়ে দেয়। পানি বের হওয়ার সুষ্ঠু কোন ব্যবস্থা না থাকায় বন্যা বেশি দিন ধরে থাকে।

নদী ভাঙন : নদী ভাঙন ফেনী জেলার জনগণের জন্য একটি বড় সমস্যা। বাংলাদেশ-ভারত দু'দেশের আন্তর্জাতিক সীমারেখার উপর দিয়ে প্রবাহিত, খরস্রোতা ফেনী নদীর ভয়াবহ ভাঙনে উত্তর ফটিকছড়ি, রামগড় ও মাটিরাঙ্গার নদী তীরবর্তী এলাকা বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ভাঙনে ক্রমশ সংকোচিত হচ্ছে মানচিত্র। এর মধ্যে লাচাড়িপাড়ার কলসীমুখ নামক এলাকাটি হুমকির মুখে। এখানে ভাঙন রোধ না করা হলে অদূর ভবিষ্যতে কলসী আকৃতির এ গ্রামটির উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়ে পুরো গ্রামই বাংলাদেশ ভূ-খণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারতের দখলে চলে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

আর্সেনিক : বিজিএস ও ডিপিএইচই র একটি গবেষণা (২০০১) থেকে দেখা গেছে যে, ফেনী জেলার নলকূপগুলোতে আর্সেনিকের গড় মাত্রা ৫৪ মাইক্রোগ্রাম/লিটার। সমীক্ষাটিতে আরো দেখা গেছে যে নলকূপগুলোর মধ্যে ২৮ শতাংশেই আর্সেনিকের মাত্রা ৫০ মাইক্রোগ্রাম/লিটারের চেয়ে বেশি ।

মাটি ও পানির লবণাক্ততা : ফেনী জেলার মাটি ও পানির লবণাক্ততার মাত্রা যথাক্রমে সর্বোচ্চ ১৫ ও ১০ পিপিএম। পানির লবণাক্ততা একদিকে যেমন সুপেয় পানির প্রাপ্যতা কমিয়ে দেয়, অপরদিকে বিভিন্ন ধরনের রোগেরও কারণও হয়ে থাকে। এমনকি মাটিতে লবণাক্ততার জন্য সব ধরনের ফসলও হয় না এবং মিঠাপানির অভাবে সবসময় সেচও দেয়া যায় না। এ ছাড়া বাঁধগুলোতে ফাটল সৃষ্টি হওয়ার কারণে কৃষি জমিতে লোনা পানি প্রবেশ করছে।

জলাবদ্ধতা : জেলায় মাঝারি নিচু জমিগুলো বর্ষা মৌসুমের শুরুতেই প্লাবিত হয় এবং পানি সরে যাওয়ার কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকায় ৫/৬ মাস পর্যন্ত এভাবেই থেকে যায়। নদীগুলো পলি পড়ে শুকিয়ে যাওয়ার কারণেও জলাবদ্ধ হচ্ছে। তবে শুধু ভূ-প্রাকৃতিক কারণেই ফেনীতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় না। ষাটের দশক থেকে লবণাক্ত পানির প্রবেশ ঠেকানো ও ফসলের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য পোল্ডার বানানো শুরু হয়। কিন্তু বর্তমানে পোল্ডারগুলোতে সুষ্ঠ পানি ব্যবস্থাপনার অভাব, অর্থের অভাবে নিষ্কাশন খাল ও পানি কাঠামোসমূহের বাৎসরিক রক্ষনাবেক্ষনের অভাব, অপর্যাপ্ত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, নদীর গতিপথ ও পানি প্রবাহের দিক পরিবর্তন, নদীতে পলি পড়ার হার পরিবর্তন, পোল্ডারের ভিতরের জলপথগুলো ভরাট হয়ে যাওয়া প্রভৃতি কারণে এখন ফেনীর অনেক এলাকাই জলাবদ্ধ হচ্ছে। কিছু কিছু এলাকায় জলপথগুলো বন্ধ করে মাছ চাষ করার প্রবণতার কারণেও জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে।

বিপদাপন্নতা

বিপদাপন্নতা শব্দটি মানুষের জীবনে বিভিন্ন নেতিবাচক ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা এবং সেই নেতিবাচক ঘটনার সাথে মানুষের অভিযোজনের ক্ষমতাকে বুঝিয়ে থাকে। বিপদাপন্নতার ধরণ, প্রকার ও ব্যপ্তিতে ভিন্নতা আছে। সব রকম বিপদাপন্নতা দ্বারা যেমন জেলার সব এলাকা আক্রান্ত হয় না, তেমনি সব পেশার, সব শ্রেণীর মানুষও সমানভাবে বিপদাপন্ন হয় না। উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের বিপদাপন্নতার উপর পরিচালিত একটি গবেষণা (সি.ই.জি.আই.এস., ২০০৪) থেকে দেখা যায় যে, ফেনী জেলার মানুষ বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক

ফেনী জেলার নির্বাচিত কিছু পেশাজীবীদের প্রধান বিপদাপন্নতা

ক্ষুদ্র কৃষক	কাজের সুযোগের অভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আর্সেনিক, নগদ অর্থের অভাব, ফসলের উপযুক্ত দাম পাওয়া, ফসলের অতিরিক্ত উৎপাদন খরচ ইত্যাদি।
জেলে	ঘূর্ণিঝড়, মাছের সংখ্যা কমে যাওয়া, পুঁজির অভাব, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থা, মাছ ধরার উপকরণের অভাব ইত্যাদি।
গ্রামীণ শ্রমিক	কাজের সুযোগের অভাব, নিম্ন মজুরী, বন্যা, পুঁজির অভাব, ঘূর্ণিঝড়, খাস জমির দখলিস্বত্ব বজায় রাখা, নিরাপদ পানীয় জলের অভাব, দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি।
শহুরে শ্রমিক	কাজের সুযোগের অভাব, পেশাগত দক্ষতার অভাব, নিম্ন মজুরী, নিরাপদ পানীয় জলের অভাব, বন্যা, আর্সেনিক, পানিবাহিত রোগ, জলাবদ্ধতা ইত্যাদি।

উৎস: সিইজিআইএস, ২০০৪

প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি হয়ে থাকে বেশি। ফেনী জেলার ক্ষুদ্র কৃষকেরা কাজের সুযোগের অভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আর্সেনিক, নগদ অর্থের অভাব, ফসলের উপযুক্ত দাম পাওয়া, ফসলের অতিরিক্ত উৎপাদন খরচ প্রভৃতি কারণে প্রধানত বিপদাপন্ন হয়। জেলেদের ক্ষেত্রে ঘূর্ণিঝড়, মাছের সংখ্যা কমে যাওয়া, পুঁজির অভাব, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থা, মাছ ধরার উপকরণের অভাব প্রভৃতি প্রধান বিপদাপন্নতা হিসেবে দেখা দেয়। অপরদিকে গ্রামীণ ও শহুরে শ্রমিকরা কাজের সুযোগের অভাব, নিম্ন মজুরী, বন্যা, পুঁজির অভাব, ঘূর্ণিঝড়, খাস জমির দখলিস্বত্ব বজায় রাখা, নিরাপদ পানীয় জলের অভাব, দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থা, পেশাগত দক্ষতার অভাব অভাবের কারণে বিপদাপন্ন হয়।

জীবন ও জীবিকা

জনসংখ্যা

ফেনী জেলার মোট জনসংখ্যা ১২.০৬ লাখ। যার মধ্যে ৫.৯৩ লাখ পুরুষ এবং ৬.১৩ লাখ নারী। লিঙ্গ অনুপাত ১০০:৯৭। মোট জনসংখ্যার ৮৬% লোক গ্রামে বাস করে। জেলায় মোট খানা/ পরিবারের সংখ্যা ২.১ লাখ। প্রতিটি খানার গড় আকার ৫.৭ জন, যা উপকূলীয় অঞ্চল গড়ের তুলনায় অনেক বেশি। ফেনী জেলায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১,৩০০ জন লোক বাস করে, যা উপকূলীয় অঞ্চল গড়ের তুলনায় অনেক বেশি।

শহুরে জনগণ (লাখ)	১.৬৯
পুরুষ	০.৯০
নারী	০.৭৮
গ্রামীণ জনগণ (লাখ)	১.০৪
পুরুষ	০.৫০
নারী	০.৫৩
লিঙ্গ অনুপাত	১০০:৯৭
নির্ভরশীল জনগণের অনুপাত	০.৯৮
জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কি.মি.)	১,৩০০

জেলার মোট জনসংখ্যার ৪২.৬% ০ - ১৪ বছর বয়সী, যা উপকূলীয় অঞ্চলের হারের তুলনায় অনেক বেশি। অপরদিকে ৭.৩% লোকের বয়স ৬০ বছরের ঊর্ধ্বে। তাই বয়সগত দিক দিয়ে এ জেলার জনগণের নির্ভরশীলতার অনুপাত ০.৯৮, যা উপকূলীয় অঞ্চলের তুলনায় বেশি।

২০০১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী মাত্র ১৪% লোক শহরাঞ্চলে বাস করে। এই অনুপাত ১৯৯১ সালে ছিল ৯%। ১৯৯১ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত শহরাঞ্চলে বাসকারী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৭৫%।

জনস্বাস্থ্য

জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ জেলায় ২টি সদর হাসপাতাল ও ৪টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স আছে। হাসপাতালগুলোতে মোট শয্যারসংখ্যা ২৩৫টি এবং শয্যাপ্রতি জনসংখ্যার অনুপাত ৫,১৪১। এই হার উপকূলীয় অঞ্চলের হারের চেয়ে অনেক বেশি, যা স্বাস্থ্য সেবার দুরবস্থার কথা তুলে ধরে। যদিও বেশ কয়েকটি বেসরকারী হাসপাতাল ও গ্রামীণ ডিসপেনসারি আছে, কিন্তু তাদের সেবার পরিমাণ যথেষ্ট নয়।

শিশু স্বাস্থ্য : এ জেলায় নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৬৮। ১২-৫৯ মাস বয়সী শিশুদের মধ্যে ৬% অপুষ্টির শিকার। অপরদিকে, ৮৭%, ৯৬% এবং ৯৯% শিশু যথাক্রমে হাম, ডিপিটি এবং পোলিও রোগের টিকা নিয়েছে। এই হার সমগ্র বাংলাদেশের গড়ের চেয়ে অনেক বেশি। জেলার ৬৯% ঘরে আয়োডিনযুক্ত লবণের ব্যবহার আছে।

নির্ভরশীলতার অনুপাত	০.৯৮
নবজাতক মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে)	৬৮
অপুষ্টির মাত্রা (%)	৬

পানি, পয়ঃ ও বাসস্থান সুবিধা : ১৯৯১ সালের আদমশুমারী থেকে দেখা যায় যে, ফেনী জেলার ২১% ঘরের দেয়াল ইট বা টিনের তৈরী। এই হার উপকূলীয় গড়ের তুলনায় অনেক কম। আবার জেলার ৬৯% ঘরের ছাদ ইট বা টিনের তৈরী। এই হারও উপকূলীয় গড়ের তুলনায় বেশি । অপরদিকে ২০০১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী দেখা যায় যে, ১% ঘর ট্যাপের এবং ৮৮% ঘর টিউবওয়েলের পানি ব্যবহার করে। এ ছাড়া ৪% ঘর গভীর নলকূপের উপর নির্ভরশীল। পুকুর ও অন্যান্য উৎসের পানি ৪% ঘরে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ফেনী জেলার লোকেরা সমগ্র উপকূলের তুলনায় ট্যাপ ও টিউবওয়েলের পানির সুবিধা বেশি পেয়ে থাকে। তবে আর্সেনিকের মারাত্মক প্রকোপ জেলার লোকদের বিপদগ্রস্ত করেছে।

একই হিসেবে আরো দেখা যায় যে, ৯% লোকের কোন প্রকার পায়খানার সুবিধা নেই। ৬৪% ঘরে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধা আছে।

শিক্ষা

ফেনী জেলায় শিক্ষিতের হার ৫৩%। এই হার উপকূলীয় গড়ের চেয়ে একটু বেশি । যদিও মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার হার (৫০%) পুরুষদের (৫৭%) তুলনায় কম । তবুও এই জেলায় মেয়েদের মধ্যে শিক্ষিতের হার উপকূলীয় অঞ্চলের হারের চেয়ে বেশি। অপরদিকে, প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে শিক্ষিতের হার ৫৮%।

শিক্ষিতের হার (৭^{+})	
মোট	৫৩%
পুরুষ	৫৭%
মহিলা	৫০%
শিক্ষিতের হার (১৫^{+})	
মোট	৫৮%
পুরুষ	৬৪%
মহিলা	৫২%

এ জেলায় মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭১৪টি। যার মধ্যে ৪০৮টি সরকারি। এ বিদ্যালয়গুলোয় মোট ১.৯ লাখ ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করে, যার মধ্যে অর্ধেকই মেয়ে। এ জেলায় ৬ থেকে ৯ বছর বয়সী শিশুদের ভর্তির গড় হার ১০৬ ভাগ, যা উপকূলীয় গড়ের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু অপরদিকে শিক্ষক প্রতি ছাত্রের অনুপাত (৬৬), উপকূলীয় গড়ের (৫০) চেয়ে বেশি এবং জনসংখ্যা অনুপাতে বিদ্যালয়ের ঘনত্বও অনেক কম (প্রতি ১০,০০০ জনের জন্য ৬টি)।

প্রাথমিক বিদ্যালয়	**৭১৪ টি**
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	**১৭৪ টি**
মাদ্রাসা	**৮৭ টি**
কলেজ	**২১ টি**

এই জেলায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৭৪টি এবং এতে প্রায় ১ লাখ ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করে। যার মধ্যে ৬০% ই ছাত্রী। জেলার মোট মাদ্রাসার সংখ্যা ৮৭টি এবং প্রায় ১৭ হাজার ছাত্রছাত্রী সেখানে পড়াশুনা করে। এই জেলায় মোট ২১টি কলেজ রয়েছে যেখানে প্রায় ১৪ হাজার ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করে।

এ ছাড়া ৪টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ১টি নার্সিং ইনস্টিটিউট, ১টি স্থানীয় সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ১টি স্থানীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ১টি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও ১টি বেসরকারী মেডিকেল কলেজ রয়েছে।

অভিবাসন

বি.বি.এস, ১৯৯১ এর সূত্রানুসারে জেলার মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩% ফেনীর বাইরে থেকে আগত।

সামাজিক উন্নয়ন

সাক্ষরতার হার (৭^{+} বছর বয়সী), নিরাপদ পানি সুবিধা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও হাসপাতালে শয্যাপ্রতি জনসংখ্যা ইত্যাদি বিষয় এলাকার সামাজিক উন্নয়নকে নির্দেশ করে। বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যায়, ফেনী জেলা সামগ্রিকভাবে সামাজিক উন্নয়নে এগিয়ে নেই।

অর্থনৈতিক অবস্থা

আয় : ফেনী জেলার মোট আয় ১৭১ কোটি টাকা (১৯৯৯/২০০০), যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের মোট আয়ের প্রায় ৩%। জেলাগত মোট আয়ের দিক থেকে এই জেলা ১৪ তম স্থানে আছে। জেলার মোট আয়ের ৫০% আসে চাকরি বা সেবামূলক খাত থেকে। কৃষিখাতের অবদানও অনেক। আয়ের ৩০% কৃষিখাত থেকে আসে, যা উপকূলীয় হারের প্রায় সমান। অপরদিকে, আয়ের মাত্র ২০% শিল্পখাত থেকে এসে থাকে। ফেনী জেলায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রায় ৪.৯ শতাংশ হারে হচ্ছে, যা উপকূলীয় অঞ্চল এবং সমগ্র বাংলাদেশের তুলনায় অনেক কম। ফেনী জেলায় মানুষের মাথাপিছু আয় মাত্র ১২,৬৬১ টাকা (১৯৯৯/ ২০০০), যা উপকূলীয় অঞ্চল গড়ের চেয়ে অনেক কম। মাথাপিছু আয়ের দিকে উপকূলীয় জেলাগুলোর মধ্যে এই জেলা সর্বনিম্নে এবং সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যে ৬০তম স্থানে আছে।

সক্রিয় জনশক্তি : ১৯৯৯/২০০০ সালের শ্রমশক্তি জরীপ অনুযায়ী দেখা যায় যে, এই জেলায় মোট কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা ৪.৮ লাখ এবং এর মধ্যে ২৩% ই মহিলা। অপরদিকে দেখা যায় যে, শহরাঞ্চলে মোট কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা ০.৭ লাখ এবং এর মধ্যে ৩৩% ই মহিলা।

প্রধান জীবিকা দল

কৃষক: কৃষি শুমারী (১৯৯৬) থেকে দেখা যায় যে, গ্রামীণ পরিবারের মধ্যে ৬৯% পরিবার কৃষি কাজে জড়িত। এদের মধ্যে ৬২.১% ক্ষুদ্র কৃষক, ৬.২% মধ্যম এবং ০.৩% বড় কৃষিজীবী পরিবার।

জেলে: জেলার অনেক লোক মাছ ধরার উপর নির্ভর করে থাকে। জেলার মোট গ্রামীণ কৃষক পরিবারের মধ্যে ১৯ শতাংশ পরিবার মাছ ধরার উপর নির্ভরশীল। এদের মধ্যে অনেকেই বংশানুক্রমিকভাবে জেলে এবং প্রধানত হিন্দু ধর্মাবলম্বী।

কৃষি শ্রমিক: চাষের জমির অভাব, কৃষি উপকরণ ও আর্থিক সামর্থ্যের অভাবের কারণে জেলায় অনেক লোকই তাদের জীবিকার জন্য কৃষি শ্রমের উপর নির্ভরশীল। বিবিএস এর কৃষি শুমারী (১৯৯৬) অনুসারে দেখা যায় যে, জেলায় গ্রামীণ পরিবারের মধ্যে ১২% পরিবার কৃষি শ্রমিক। এই হার দিনে দিনে বাড়ছে।

শহুরে শ্রমিক : ফেনী জেলার শহরাঞ্চলে শ্রমিকের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। গ্রামাঞ্চলে কাজের অভাব, বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে লোকজন সর্বস্বান্ত হয়ে গ্রাম থেকে শহরে এসে দিন-মজুরে পরিণত হচ্ছে।

দারিদ্র্য

এই জেলায় পুষ্টি গ্রহণের ভিত্তিতে ৫৪% লোক দরিদ্রসীমার নিচে বাস করে । এই হার জাতীয় (৪৯%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের তুলনায় বেশি। তবে ২০% লোক অতিদরিদ্র সীমার নিচে বাস করে, যা জাতীয় ও উপকূলীয় অঞ্চলের তুলনায় কম । আবার গ্রামীণ জনগণের ৫৪% পরিবারই ভূমিহীন।

দরিদ্র	৫৪%
অতি দরিদ্র	২০%
ভূমিহীন	৫৪%
ক্ষুদ্র কৃষক	৬২%

নারীদের অবস্থান

উপকূলীয় অঞ্চল ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নোয়াখালী জেলার নারীদের অবস্থান কিছুটা ভিন্ন। সিপিডি-ইউ.এন.এফ.পি.এ বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মোট জনসংখ্যা, সাক্ষরতার হার এবং অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় জনসংখ্যার বিচারে নারী-পুরুষের অসমতার একটি ধারাক্রম নির্ধারণ করে একটি লিঙ্গ সম্পর্কিত উন্নয়নসূচক তৈরি করেছে। এই হিসাব অনুযায়ী ফেনী জেলা মধ্যম মাত্রার লিঙ্গীয় অসমতাপূর্ণ জেলা। ফেনী জেলার নারীদের অবস্থান বিশেষ কিছু সূচকের ভিত্তিতে আলোচনা করা হল।

নারী-পুরুষ অনুপাত: ফেনী জেলার মোট জনসংখ্যার ৫১% নারী। জেলার লিঙ্গ অনুপাত ১০০:৯৭, যা উপকূলীয় অঞ্চল ও বাংলাদেশের তুলনায় বিপরিতধর্মী। অপ্রাপ্ত বয়স্ক (০-১৪ বছর) জনসংখ্যায় লিঙ্গ অনুপাত ১০০:১০৮ কিন্তু প্রজননক্ষম বয়সদলে (১৫-৪৯ বছর) লিঙ্গ অনুপাত ১০০:৮৫।

প্রজনন স্বাস্থ্য : পরিবার পরিকল্পনা তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (FPMIS-১৯৯৯)-এর তথ্য অনুসারে, জেলায় মাতৃমৃত্যুর হার ৪, যা নানা প্রপঞ্চ দ্বারা প্রভাবিত। খাদ্যের অসম বন্টন, ঝুঁকিপূর্ণ সন্তান জন্মদান, আধুনিক স্বাস্থ্য সেবার অভাব যেমন, ডাক্তার, ক্লিনিক ও হাসপাতালের অভাব মায়েদের মৃত্যু হারকে প্রভাবিত করে। ফেনী জেলার নারীরা তাদের জীবদ্দশায় গড়ে ২.৫৫ টি শিশুর জন্ম দিয়ে থাকেন এবং এই হার ধীরে ধীরে কমে আসছে। জেলার ৩৯% নারী আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে ৪১%।

বৈবাহিক অবস্থা : জেলার ১০ বছর ও তার উর্ধ্বে মোট জনসংখ্যার মধ্যে ৩১% নারী বিবাহিত এবং ০.১৮% নারী স্বামী পরিত্যক্তা (বি.বি.এস, ২০০১)। এখানে বিয়ে নিবন্ধনের হার ৯২% (বি.বি.এস.-ইউনিসেফ, ২০০১)।

শ্রমশক্তি : সমগ্র বাংলাদেশের ন্যায় উপকূলীয় অঞ্চলেও নারী-পুরুষের কাজের মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায়। নারীরা প্রধানত পরিবারিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রম দেয়। পর্দা প্রথা, প্রথাগত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাব, অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থা, কঠোর ধর্মীয় অনুশাসন ইত্যাদির প্রভাবে অকৃষিখাত বা চাকরি ও সেবামূলকখাতে নারীদের অংশগ্রহণ অনেক কম হয়ে থাকে। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত নারীরা নানা ধরনের কাজের সাথে যুক্ত হতে বাধ্য হয়। এ ছাড়া শিক্ষার ক্রমবিস্তার, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, এনজিও-দের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী, সরকারি ও বেসরকারি সচেতনতামূলক কার্যক্রমের ফলে প্রথাগত ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। শ্রমশক্তি জরিপ (১৯৯৯/২০০০) অনুসারে ১৯৯৯-২০০০ সালে ফেনী জেলার মোট শ্রম শক্তির ২৩% ছিল নারী। এই হার উপকূলীয় গড়ের চেয়ে অনেক কম। তবে শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী আরো দেখা যায় যে, শহরাঞ্চলে নারীদের অংশগ্রহণ (৩৩%) গ্রামাঞ্চলের (২২%) তুলনায় বেশী এবং তা উপকূলীয় গড়ের তুলনায়ও অনেক বেশি। জেলার ১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে মাত্র ২২% অর্থ বা খাদ্যের বিনিময়ে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত, যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে ২৬% (নিপোর্ট, ২০০৩)।

নারীর অবস্থান

- সার্বিক ও প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে শিক্ষিতের হার উপকূলীয় অঞ্চল ও বাংলাদেশের হারের চেয়ে অনেক বেশী।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়ে শিশুর ভর্তির হার বেশী।
- নারী ও পুরুষের অনুপাত (১০০:৯৭) নারীর অনুকূলে।
- মেয়ে শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির হার উপকূলীয় অঞ্চলের সমান।
- ঘরে বা বাড়িতে সন্তান প্রসবের হার বাংলাদেশের হারের চেয়ে বেশী।
- সক্রিয় শ্রম শক্তিতে নারীদের অংশগ্রহন অনেক কম।
- কৃষিজীবি গ্রামীণ পরিবারে নারীপ্রধাণ গৃহের সংখ্যা কম।
- মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৪ জন , যা জাতীয় (৫ জন) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৫ জন) তুলনায় কম ।
- জেলায় ১৩-৪৯ বয়স দলের নারীদের মধ্যে আধুনিক জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার ৩৯%, যা জাতীয় (৪৪%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৪১%) হারের তুলনায় কম।

কিন্তু, শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হারের তুলনায় নারীদের মজুরী প্রাপ্তি অনেক কম। কৃষি শুমারী (১৯৯৬) অনুযায়ী দেখা যায় যে, ২২% নারী কৃষি কাজে অংশগ্রহণ করা সত্ত্বেও কোন প্রকার মজুরী পায় না। আবার কৃষি কাজে অংশগ্রহণকারি নারী শ্রমিকরা পুরুষদের প্রায় তিন ভাগের দুই ভাগ মজুরী পেয়ে থাকে। এই হার চর ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে অর্ধেকেও নেমে আসতে পারে।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি : স্বাস্থ্য ও পুষ্টিগতমান নারীদের অবস্থানের এক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা ও সচেতনতার অভাবে নারীদের ৯৪% ই ঘরে সন্তান প্রসব করে থাকেন। এই হার বাংলাদেশে গড়ের চেয়ে বেশি। প্রসবকালীন সময়ে ১৭% ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাই ও ১৭% ক্ষেত্রে ডাক্তাররা সহায়তা করে থাকেন। আবার ৬৬% ক্ষেত্রে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীরা সহায়তা করে থাকেন।

এই জেলায় নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৬৮ জন, যা বাংলাদেশ গড়ের চেয়ে অনেক বেশি। শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির হারও অত্যন্ত বেশি। জেলার ৬% শিশুই চরম অপুষ্টির শিকার এবং মেয়ে শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির হার (৬%) ছেলে শিশুদের সমান ।

শিক্ষা : শিক্ষা ক্ষেত্রে ফেনী জেলার নারীরা কিছুটা এগিয়ে আছে। সার্বিক ও প্রাপ্ত বয়স্কশিক্ষার হার (যথাক্রমে ৫০% ও ৫২%) উপকূল ও বাংলাদেশ হারের চেয়ে অনেক বেশি। যদিও তা পুরুষদের শিক্ষার হারের তুলনায় কম। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়েদের ভর্তির হার ছেলের তুলনায় বেশি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় মোট ছাত্রছাত্রীর অর্ধেকই মেয়ে। মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে ৬০% ই ছাত্রী। কলেজগুলোতে এবং মাদ্রাসাগুলোতে প্রায় ৪০% ছাত্রী। এই অবস্থান উপকূলীয় প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

নারী নির্যাতন : ঘরের ভেতরে-বাইরে নারীরা প্রতিনিয়তই নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার। ঘরে নারী নির্যাতন জেলার একটি অতিপরিচিত ঘটনা।

অবকাঠামো

রাস্তা-ঘাট

এই জেলায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীনে মোট ৩০৪ কি. মি. রাস্তা নির্মিত হয়েছে। এর মধ্যে জাতীয় মহাসড়ক ৫০ কি. মি. এবং উপজেলা সদরগুলোর মধ্যে সংযোগকারী সড়ক ২৫৪ কি. মি.। এ ছাড়াও এলজিইডি-র অধীনে ১,৪০৬ কি. মি. রাস্তা নির্মিত হয়েছে। সব মিলিয়ে এই জেলায় রাস্তার ঘনত্ব ১.৫২ কি. মি./ বর্গ কি. মি., যা উপকূলীয় অঞ্চল ও বাংলাদেশের ঘনত্বের চেয়ে অনেক বেশি। তবে চর ও গ্রাম অঞ্চলের রাস্তা-ঘাটের অবস্থা ভাল নয়।

পাকা রাস্তা	১,৪০৬কি.মি.
সওজ রাস্তা	৩০৪ কি.মি.
এলজিইডি রাস্তা	১,১০২ কি.মি
রাস্তার ঘনত্ব	১.৫২ কি.মি./ বর্গ কি.মি.

পোল্ডার

অধিক ফসল উৎপাদন ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে গণ-মানুষকে রক্ষার তাগিদে ষাটের দশকে ফেনী জেলায় পোল্ডার নির্মাণের কাজ শুরু হয়। এ পর্যন্ত প্রায় ২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে, যা প্রায় ৯ হাজার হেক্টর জমিকে লোনা পানির হাত থেকে রক্ষা করে থাকে। ১০টি রেগুলেটর ও ১৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ পানি নিষ্কাশন চ্যানেলের মাধ্যমে পোল্ডারগুলো থেকে পানি নিষ্কাশন করা হয় (সি.ই.আর.পি, ২০০০)।

বাঁধ	২৬ কি.মি.
রেগুলেটর	১০টি
নিষ্কাশন খাল	১৫০ কি.মি.

মুহুরী নদীর ধারা সাগরে মিলিত হওয়ার ৩/৪ কিলোমিটার উজানে ১ কিলোমিটারের বেশি লম্বা বাঁধ আড়াআড়িভাবে তৈরী করা হয়েছে। একে ক্লোজার ড্যাম (Closure Dam) বলা হয়। এখানে একটি ৪০ ভেন্টের রেগুলেটরও তৈরী করা হয়েছে। উদ্দেশ্য, বৃহত্তর নোয়াখালীর বিভিন্ন এলাকায় স্বল্প উত্তোলন ক্ষমতা সম্পন্ন পাম্প ব্যবহার করে সেচ কার্য পরিচালনা করা। ভারী জোয়ারের সময় লবণপানি ভিতরে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করার জন্যও এই বাঁধ এবং রেগুলেটর কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে। দুটি জেলার বৃহত্তর (নোয়াখালী-চট্টগ্রাম) সমুদ্র উপকূলীয় এলাকার রাস্তা ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছে।

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র

এ জেলায় মোট ১০৬টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে। এ আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে জেলার ১৮% লোক আশ্রয় নিতে পারে। বছরের অন্যান্য সময় এই আশ্রয়কেন্দ্রগুলো প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

১৯৯৮ সালের হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, এই জেলায় মোট ১০৮টি ক্লাব, ২৯টি কমিউনিটি সেন্টার, ১০৯৮টি সমবায় সমিতি, ৩০টি পেশাজীবী সংগঠন আছে। ১,৮০৮টি মসজিদ, ১৫২টি মন্দির ও ২টি চার্চ আছে।

এ ছাড়া ৬টি সিনেমা হল, ৭টি লাইব্রেরি, ১টি লিটারারি সোসাইটি, ৭টি থিয়েটার গ্রুপ, ১টি থিয়েটার মঞ্চ, ১৭টি নারীদের সংগঠন, ১টি শিল্পকলা একাডেমি ও ৪টি কম্যুনিটি সেন্টার আছে ।

অর্থনৈতিক অবকাঠামো

ব্যাংক ও ঋণ সুবিধা : ফেনী জেলায় প্রধান সবগুলো ব্যাংকেরই শাখা আছে। এক হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯৯৯-২০০০ সালে জেলার ব্যাংকগুলোতে প্রায় ৫ হাজার মিলিয়ন টাকা জমা ছিল। এই সঞ্চয় ১৯৯৩-৯৪ সাল থেকে ৯৪% বৃদ্ধি পেয়েছে, যা উপকূলীয় হারের চেয়ে অনেক বেশি এবং জেলার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রবণতার সাথে সংগতিপূর্ণ।

অপর আরেক হিসেবে দেখা যায় যে, প্রধান চারটি ক্ষুদ্র ঋণ দানকারী এনজিও (ব্র্যাক, আশা, কারিতাস ও প্রশিকা) জেলার প্রায় ২৩% পরিবারকে ঋণ দিয়েছে। এ ছাড়া আরো অনেক স্থানীয় এনজিও ঋণ দিয়ে থাকে।

হাট-বাজার ও বন্দর : ১৯৯৬ সালের হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, ফেনী জেলায় মোট ২০টি হাট-বাজার কেন্দ্র আছে। প্রতিটি কেন্দ্রে গড়ে ৪৬ বর্গ কিলোমিটারের লোক সুবিধা ভোগ করে, যা উপকূলীয় গড়ের চেয়ে অনেক কম।

বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগ : জেলার মোট ৪৭% বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে। তবে শহর ও গ্রামে বৈদ্যুতিক সংযোগের ক্ষেত্রে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। শহরের মোট ৬৯% ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে। অথচ গ্রামে এর পরিমাণ মাত্র ৪৩%। এই হার নগরায়ণের বিস্তারকে চিহ্নিত করে। উল্লেখ্য, ১৯৯১ সালে জেলার মাত্র ১৪% ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল। এই জেলায় মোট ১,৯৫১ টি টেলিফোন সংযোগ রয়েছে।

শিল্প ও বাণিজ্য অবকাঠামো

এই জেলায় প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের শিল্প আছে। এদের মধ্যে পাট কল, ধান মাড়াইর কল, আটা তৈরির কল, তেল তৈরির কল, বল পয়েন্ট তৈরি কারখানা, কোল্ডস্টোরেজ, ঔষধ ফ্যাক্টরি, টেক্সটাইল মিল, ইস্পাত কল, কার্পেট তৈরির কারখানা, রুটি ও বিস্কুট ফ্যাক্টরি, বরফ কল এবং লোহা-লক্কর ও ঝালাইয়ের কারখানা অন্যতম।

কুটির শিল্পের মধ্যে বাঁশ-বেতের কাজ, মাদুর ও পাটি বোনা, স্বর্ণকার, কামার, চামড়া ও রাবারের কাজ, সেলাই, কুমার, কাঠের কাজ, পিতল ও তামার কাজ, দর্জি প্রভৃতি অন্যতম। ফেনী জেলার পরশুরাম উপজেলা এক সময় শীতল পাটির জন্য বিখ্যাত ছিল। এখানকার পাটি এক সময় দেশের বিভিন্ন জেলায় এমনকি দেশের বাইরেও রপ্তানী হতো। কিন্তু বর্তমানে এই শিল্প প্রায় বিলুপ্তির পথে। পোড়া মাটির ইট নির্মাণ ও সরিষার তেল উৎপাদনে ফেনীর একটি ঐতিহ্য আছে।

কৃষি অবকাঠামো

কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি অনেকাংশেই কৃষি অবকাঠামোর উপর নির্ভরশীল। ফেনী জেলার মোট আবাদকৃত জমির ৫৩% জমিতে সেচ দেয়া হয়। এই হার উপকূল গড়ের চেয়ে অনেক বেশি (৩০%) এবং বাংলাদেশ গড়ের (৫০%) চেয়েও বেশি। আবার প্রায় ৩৯% জমিতে ভূ-পৃষ্ঠের পানি থেকে সেচ দেয়া হয়। জেলায় মোট ৯৭৫টি অগভীর নলকূপ, ৫৬টি শক্তিচালিত পাম্প এবং ১,৭৮৬টি এলএলপি আছে। কৃষি শুমারী থেকে দেখা যায় ৯৪% গ্রামীণ কৃষক পরিবার জমিতে রাসায়নিক সার ব্যবহার করে থাকে, ২% পরিবার ট্রাক্টর ও ৬০% পরিবার পাওয়ার টিলার ব্যবহার করে থাকে। প্রায় ১৭ শতাংশ বাড়িতে ধান মাড়াইর কল রয়েছে। ৫৪% বাড়িতে শস্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। বিবিএস (১৯৯৮) -এর তথ্য অনুসারে এই জেলায় মোট ২৬টি গুদাম রয়েছে। যার মোট ধারণক্ষমতা হল ১৪,১৫০ মে. টন। এখানে ৪৪ টি ডেইরি ফার্ম, ৭০টি

সেচ এলাকা (মোট)	২৯,৩৪৩ হেক্টর
সেচ এলাকা (%)	৫৩%
ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার	৩৯%
উপরিভাগের পানি ব্যবহার	১৪%

গুদামের ধরন	সংখ্যা	ধারন ক্ষমতা (মে:টন)
খাদ্য	২৫	১৪,১৫০
বীজ	১	–

পোলট্রি ও ৯টি হ্যাচারী রয়েছে। এছাড়াও জেলায় ১টি সরকারী হর্টিকালচার সেন্টার এবং ১৩৫টি বেসরকারী নার্সারী আছে।

উন্নয়ন প্রকল্প

উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়ন প্রকল্পের উপর পরিচালিত এক সমীক্ষা (পিডিও-আইসিজেডএমপি ২০০৪) থেকে দেখা যায়, ফেনী জেলায় ১৬টি সরকারী প্রকল্প চালু আছে। এই প্রকল্পগুলো ১০টি সরকারী সংস্থা বাস্তবায়ন করছে। এদের মধ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, পশুসম্পদ অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, পলী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড অন্যতম।

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্প হল চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প; পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২২ / ২৩; বৃহত্তর নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলায় পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প; বৃহত্তর নোয়াখালী জেলায় মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প; পৌরসভা, থানা ও বাজার কেন্দ্রে পানি সরবরাহ, পয়ঃ ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং আবর্জনা অপসারণ (নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষীপুর, পটুয়াখালী এবং বরগুনা জেলা) প্রকল্প; নদী সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর রক্ষা প্রকল্প; ক্ষুদ্রায়তন বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প; সীমান্ত নদী সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প; নতুন ডাকাতিয়া, পুরাতন ডাকাতিয়া ও ছোট ফেনী নদী বেসিন উন্নয়ন প্রকল্প; জাপানি সহায়তায় ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র পূর্ণবাসন প্রকল্প; চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প; ৯ শহর বিদ্যুৎ সঞ্চালন প্রকল্প; দক্ষিণাঞ্চলের পাঁচটি জেলায় পশু সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প; ফেনী-পরশুরাম-বেলোনিয়া রোডকে আঞ্চলিক মহাসড়কে উন্নয়ন প্রকল্প; ফেনী-সোনাগাজী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প; গ্রামীণ নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রকল্প; ফেনী জেলায় একটি কম্পিউটার ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প অন্যতম। জেলার উন্নয়নে এনজিওদের অবদানও অনস্বীকার্য। এই জেলায় কর্মরত প্রধান এনজিওগুলোর মধ্যে এনআরডিএস, ইপসা, বন্ধন, হোপ, কেয়ার, এমসিসি, আশা, এমএমসি, রিক, ব্র্যাক ও প্রশিকা অন্যতম।

সরকারী সংস্থা	প্রকল্প সংখ্যা
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	২
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	১
স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর	৪
মৎস্য অধিদপ্তর	১
পশুসম্পদ অধিদপ্তর	১
জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তর	২
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	২
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	২
পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	১
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	১

ফেনী ও মধুমতি নদীর ভয়াবহ ভাঙন

ট্রান্সফরমারসহ বিভিন্ন যান্ত্রিক ত্রুটি নির্মাণের দেড় বছর পরও চালু করা যায়নি দাগনভূঞা বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রটি

37 posts of doctor lying vacant in Feni district

মুহুরীর চরে ভারতীয়দের বাসস্ট্যান্ড নির্মাণচেষ্টা ব্যর্থ

Early rehabilitation of farmers needed

Flood damaged 85 pc aman paddy in Feni

পরশুরামে মুহুরী নদীর ভাঙনে ১২০টি পরিবার গৃহহীন

Steps to provide treatment to crippled fails

Will Feni Trauma Centre start work at all?

Feni poura dwellers still lack basic civic rights

Loss of aman plants on 62,000 hectares in Feni

সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা

ফেনী জেলার মানুষ একদিকে যেমন বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার অপরদিকে পারিপার্শ্বিকতার ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার দ্বারাও আক্রান্ত হয়। প্রাচীনকাল থেকেই এই জেলার মানুষ ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও নদী ভাঙ্গনের সাথে লড়াই করে আসছে। কিন্তু সব সমস্যা দ্বারা যেমন জেলার সব এলাকা আক্রান্ত হয় না তেমনি সব পেশার, সব শ্রেণীর মানুষও সমানভাবে আক্রান্ত হয় না। নীচে বিভিন্ন সময়ে জনগণের সাথে আলোচনার ফলে উঠে আসা প্রধান কিছু সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার কথা আলোচনা করা হল :

পরিবেশগত সমস্যা

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস: জেলার সোনাগাজী উপজেলা ঘূর্ণিঝড়ের কারণে অধিক ঝুঁকির সম্মুখীন। জেলার ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রগুলো মোট ১৮% লোককে আশ্রয় দিতে পারে যা যথেষ্ট নয়। এ ছাড়া জেলার প্রচুরসংখ্যক লোক সমুদ্রে যেয়ে মাছ ধরে। উপযুক্ত সতর্কীকরণ ব্যবস্থা ও নৌকায় জীবনরক্ষাকারী উপকরণের অভাবে ঘূর্ণিঝড়ের সময় তাদের জীবন বিপদসংকুল হয়।

আকস্মিক বন্যা ও পাহাড়ি ঢল: ফেনী অঞ্চলের প্রধান নদীগুলো ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়িয়া অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সেখানকার পাহাড়-পর্বত কেটে আবাদী জমি বৃদ্ধির ফলে পরিবেশগত পরিবর্তন ঘটছে। বর্ষাকালে সেখানকার পানি দ্রুত ফেনী জেলায় প্রবেশ করে, যা ফেনীর নদীগুলোর ধারণ ক্ষমতার বাইরে। তাই বর্ষাকালে ফেনীর জনপদ সহজেই প্লাবিত হয়ে এখানকার ফসল ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। পানি উন্নয়ন বোর্ডের পুরোনো একটি হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় ১৯৫০ থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে কেবল মুহুরী নদীর পাহাড়িয়া ঢলেই ছাগলনাইয়া ও পরশুরাম এলাকায় বার্ষিক গড়ে প্রায় এক কোটি টাকার ফসল ও সম্পদ বিনষ্ট হয়।

পরিবেশগত সমস্যা
- ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস
- আকস্মিক বন্যা ও পাহাড়ি ঢল
- নদী ভাঙন
- মাটি ও পানির লবণাক্ততা
- জলাবদ্ধতা
- আর্সেনিক
- মাছের প্রজাতি হ্রাস
- বন উজাড়

আইন-শৃঙ্খলাগত সমস্যা
- সীমান্ত বিরোধ
- আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি

আর্থ-সামাজিক সমস্যা
- কৃষি বিষয়ক সমস্যা
- অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা

নদী ভাঙন : বন্যাকবলিত ও সীমান্তবর্তী উপজেলা পরশুরামের প্রধান সমস্যা মুহুরী নদীর ভাঙন। স্থায়ী সমাধান না হওয়ায় প্রতি বছরই মুহুরী নদীর ভাঙনে হাজার হাজার লোকের জীবনে নেমে আসে দুর্দশা। সীমান্ত বর্তী হওয়ায় ভারতীয় উজানের পানির তোড়ে সহজেই মুহুরীর ভাঙন সৃষ্টি হয়। পরশুরাম উপজেলার বন্যা সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন মুহুরী নদীর বেড়িবাঁধ সংরক্ষণের স্থায়ী ব্যবস্থা। অন্যথায় প্রতি বছরই হাজার হাজার মানুষ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়বে, গৃহহীন হয়ে পড়বে, হাজার হাজার একর জমি পরিণত হবে বালুচরে।

মাটি ও পানির লবণাক্ততা : পানির লবণাক্ততা একদিকে যেমন সুপেয় পানির প্রাপ্যতা কমিয়ে দেয় অপরদিকে বিভিন্ন ধরনের রোগেরও কারণও হয়ে থাকে। অপরদিকে মাটিতে লবণাক্ততার জন্য সব ধরনের ফসলও হয় না এবং মিঠা পানির অভাবে সব সময় সেচও দেয়া যায় না। এই জেলায় মাটি ও পানির লবণাক্ততার মাত্রা ধীরে ধীরে বাড়ছে।

জলাবদ্ধতা: জেলায় জলাবদ্ধতা একটি প্রধান সমস্যা। বর্ষাকালে পানি জমে থাকার কারণে জেলায় নিচু এলাকায় রোপা আমন ধানের সুযোগ থাকলেও তা করা যায় না।

আর্সেনিক: আর্সেনিক আক্রান্ত জেলাগুলোর মধ্যে ফেনী অন্যতম। জেলার নলকূপগুলোর মধ্যে ২৮ শতাংশেই আর্সেনিকের মাত্রা ৫০ মাইক্রোগ্রাম/লিটারের চেয়ে বেশি, যা স্বাস্থ্যগত দিক থেকে গ্রহণযোগ্য মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি। এত বেশিমাত্রার আর্সেনিক শুধু ত্বকের রোগই সৃষ্টি করে তাই নয়, বেশি দিনের সংক্রমণে এটি ক্যান্সার ও ফুসফুসের রোগ সৃষ্টি করে।

মাছের প্রজাতি হ্রাস : ফেনী জেলায় গ্রামীণ কৃষক পরিবারের মধ্যে প্রায় ১৯ শতাংশ পরিবার মাছ ধরার উপর নির্ভরশীল। অতিরিক্ত মাছ ধরার কারণে তীরবর্তী অঞ্চলগুলোর অগভীর পানির মাছ আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে। আগে যে পরিমাণ মাছ পাওয়া যেত এখন আর সেই পরিমাণ পাওয়া যায় না।

বন উজাড় : বনদস্যু ও বিভিন্ন বাহিনীদের উপদ্রবের ফলে বিলীন হয়ে যাচ্ছে বনভূমি। খাস জমি দখল ও নগদ অর্থের জন্য চলে বন ধ্বংসের মহোৎসব। এলাকার জোতদার ও টাউটরা ভূমিহীনদের সামনে রেখে দখল করে নিচ্ছে বনভূমি। ফলে এলাকার পরিবেশ যেমন বিপন্ন হচ্ছে তেমনি ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ফলে ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনাও বেড়ে যাচ্ছে।

আইন-শৃঙ্খলাগত সমস্যা

সীমান্ত বিরোধ : সীমান্ত বিরোধ ফেনী জেলার জনগণের জীবনে একটি বড় সমস্যা। সীমান্ত নদীগুলোয় ভারত কর্তৃক পাম্প বসিয়ে জোরপূর্বক পানি উত্তোলন, বাঁধ নির্মাণ, নিয়ন্ত্রিত এলাকায় বিভিন্ন ধরনের কাঠামো নির্মাণ প্রভৃতির কারণে প্রায়শই সীমান্ত এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়ে থাকে। আবার ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি অনুযায়ী সীমানা নির্ধারণের জন্য পূর্বে নদীর গতি পথকে ধরা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে ভারতীয়রা নদীর অর্ধেক পর্যন্ত দাবী করছে। ফলে নদীর বুকে জেগে ওঠা চরগুলো ভারতের দখলে চলে যাচ্ছে। এ নিয়েও বিভিন্ন সময় দু'দেশের সীমান্ত রক্ষী ও স্থানীয় জনগণের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। নদীগুলোর ভারতীয় অংশে বাঁধ ও অন্যান্য কাঠামো নির্মাণের ফলে বাংলাদেশ অংশে নদী ভাঙন ও বন্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

ত্রিপুরা রাজ্যের বেলুনিয়া শহর মুহুরী নদীকে নদীর তীরে অবস্থিত। স্বাভাবিকভাবেই নদীর ভাঙ্গন থেকে শহরটিকে রক্ষা করার জন্য ভারতীয়রা নানারকম রক্ষা বাঁধ তৈরী করে। এর একটি পদ্ধতি ইমপারমিবেল স্পার। স্পার তৈরী হলে এক তীরের ভাঙ্গন বন্ধ হয়ে অন্য তীরে ভাঙ্গন শুরু হয়। ভারতীয় অংশে বাঁধ দিলে বাংলাদেশের মাটি ভাঙতে শুরু করে। ফলে শুরু হয় দু'দেশের মধ্যে নদী নিয়ে বিরোধ। দু'দেশের সীমান্তরক্ষীদের মধ্যে দেখা দেয় উত্তেজনা। যা কখনো কখনো সংঘর্ষের রূপও নেয়।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি: আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ফেনী জেলার জন্য একটি বড় সমস্যা। বিস্তীর্ণ চরাঞ্চল থাকার কারণে প্রশাসনিক ব্যবস্থা সব সময় সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারে না। সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থার অভাবে চরগুলোতে

সারা বছরই এবং বিশেষ করে ফসল কাটার মৌসুমে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিশেষ অবনতি ঘটে। দস্যুরা জোর করে ফসল কেড়ে নিয়ে যায়, চাঁদা দিতে বাধ্য করে, নদীবক্ষ ও সাগরে করে ডাকাতি। আবার স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে জানা যায় যে, এই এলাকায় বিপুল পরিমাণ চোরাচালান হয় যার ফলে সরকার হারাচ্ছে মূল্যবান রাজস্ব।

আর্থ-সামাজিক সমস্যা

কৃষি বিষয়ক সমস্যা : জেলার কৃষি ব্যবস্থার প্রধান সমস্যাগুলোর মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পঙ্গপালের (পামুরি) আক্রমণ, উন্নত ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ও দুর্যোগ থেকে ফসল রক্ষা করার জ্ঞানের অভাব। আবার রোপা আমন, আউশ, বোরো ধানে প্রায় প্রতি বছরই বিভিন্ন রকমের পোকা লাগে। এই পোকা-মাকড় ফসল ধ্বংস করে ফেলে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলেও ফসল নষ্ট হয়।

অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা : যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার জন্য কৃষক ও জেলেদের পণ্য বাজারজাত করতে সমস্যা হয়।

মুহুরী বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ জরুরি

Govt-NGO cooperation needed to ensure safe drinking water

Preservation of forest resources urged

Women in informal job sectors

Policy framework for diversified for diversified agriculture

আর্সেনিক গবেষণায় নতুন সাফল্য

বিষ নয়, ফাঁদে আটকে ক্ষতিকর কীট দমন

'NGOs should do more for poverty alleviation'

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সার্কুলার

কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প চা বছরের জন্য আয়করমুক্ত

ছয় বছর পড়ে থাকার পর ফেনী গ্যাস ফিল্ড পুনঃখননের উদ্যোগ

সম্ভাবনা ও সুযোগ

ফেনী জেলার মানুষের সামগ্রিক জীবনমানের উন্নয়নের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। সম্পদ ও সুযোগের উপযুক্ত ব্যবহার করে জেলার প্রভূত উন্নয়ন সাধন সম্ভব। বিভিন্ন পর্যায়ের আলোচনায় চিহ্নিত কয়েকটি প্রধান সম্ভাবনার কথা নিচে আলোচনা করা হল।

শিল্প উন্নয়ন

শিল্পাঞ্চল : ঢাকা ও চট্টগ্রামের মধ্যে সুবিধাজনক স্থানে অবস্থান, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ফেনী জেলার শিল্পায়নের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। প্রতিটি উপজেলায়ই একটি করে ইপিজেড বা শিল্পাঞ্চল স্থাপন করা সম্ভব। এ সব শিল্পাঞ্চল থেকে উৎপাদিত দ্রব্য পার্শ্ববর্তী ভারতের ত্রিপুরাসহ বিভিন্ন রাজ্যে রপ্তানী করার উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় চুক্তি সম্পাদনের জন্য ত্রিপুরা রাজ্য প্রধান আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

ফেনী জেলার কিছু উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা

- **শিল্প উন্নয়ন**
  - শিল্পাঞ্চল
  - গ্যাস আহরণ
  - ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার
- **কৃষি উন্নয়ন**
  - কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি
  - মাছ চাষ
  - হাঁস মুরগি ও গবাদী পশু পালন
- **প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবহার**
  - বনজসম্পদের ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ
  - জমির সুষ্ঠু ব্যবহার
  - সামুদ্রিক সম্পদ আহরণ
- **অবকাঠামোগত উন্নয়ন**
  - দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো উন্নয়ন
  - যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি

গ্যাস আহরণঃ ফেনী গ্যাস ক্ষেত্র থেকে গ্যাস আহরণের জন্য সরকার পদক্ষেপ নিয়েছে। যদি পুনরায় এই ক্ষেত্র থেকে গ্যাস আহরণ করা যায় তবে তা এলাকার জ্বালানি সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখবে। এ ছাড়া গ্যাসভিত্তিক শিল্প কারখানাও স্থাপন করা যেতে পারে।

ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার : এই জেলায় কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্পের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। জেলার প্রধান অর্থকরী ফসল যেমন পাট, তৈলবীজ, নারিকেল, সুপারি, ছন, বাঁশ, বেঁতভিত্তিক কুটির শিল্প স্থাপন করা যেতে পারে। এ জন্য জনগণকে প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা করা যেতে পারে।

কৃষি সম্পদ উন্নয়ন

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিঃ জলাবদ্ধতা কৃষির উন্নয়নে একটি প্রধান বাধা। বৃষ্টির পানি যাতে জমিতে জমে না থাকতে পারে সে ব্যবস্থা করা হলে উচ্চ ফলনশীল জাতের আউশ, রোপা আমন এবং রবি শস্যের প্রচুর পরিমাণ আবাদ করা যেতে পারে। এ ছাড়া সুষম সার প্রয়োগ, জৈব সারের ব্যবহার বৃদ্ধি, উন্নত জাতের বীজের ব্যবহার এবং উন্নত পরিচর্যার মাধ্যমে বর্তমানে উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব।

মাছ চাষ : ফেনী জেলার প্রায় ৭০% পুকুরে মাছ চাষ করা হয়ে থাকে এবং হেক্টর প্রতি মাছের উৎপাদন ৩.৪ মেট্রিক টন। আবার পরিত্যক্ত ও চাষযোগ্য পুকুরের পরিমাণ ৩০%, যেখানে মাছের গড় উৎপাদন বছরে ১.৭০ মে.ট./হে.। এর হার উপকূলীয় ও বাংলাদেশ গড়ের চেয়ে বেশি। কিন্তু যদি জেলার সব পুকুরগুলোকে উন্নত মাছ চাষ পদ্ধতির আওতায় আনা হয় তবে উৎপাদন অনেক বাড়তে পারে।

হাস-মুরগী ও গবাদি পশু পালন : ফেনী জেলায় প্রচুর পরিমাণ পুকুর আছে যেখানে হাস পালন সম্ভব। এ ছাড়া চরাঞ্চলে বিস্তীর্ণ এলাকা গরু মহিষের চারণভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উন্নতমানের প্রাণী খাদ্য, ওষুধ, চিকিৎসা এবং পণ্য বাজারজাতকরণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা হলে এই জেলায় গবাদি পশুপালনের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার ও সংরক্ষণ

বনজ সম্পদের ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ : ফেনী জেলার সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় ম্যানগ্রোভ বন সৃজন করা হয়েছে। এই বন একদিকে যেমন ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের প্রকোপ কমায়, অপরদিকে স্থানীয় লোকজনের কাঠ, জ্বালানি, পশু খাদ্যের চাহিদা পূরণ করে। যদিও ক্রমবর্ধমান চাহিদার ফলে অনেক এলাকাতেই বন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বনজ সম্পদের চাহিদা রয়ে গেছে। তাই স্থানীয় জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করে বাঁধ, রাস্তা, সাইক্লোন শেল্টার, স্কুল, অফিস ও খাস জমিতে সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে বনায়ন করতে হবে।

জমির সুষ্ঠু ব্যবহার : ফেনী জেলা অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ একটি জেলা। একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে ফেনী জেলার জমির সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব। উপযুক্ত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, বাঁধ পুণর্বাসন, খাল খনন, নদী ভাঙন রোধ প্রভৃতির মাধ্যমে জমির নিবিড় ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। লবণসহ ও পানিসহ ফসলের চাষ করে কৃষি জমির উৎপাদন বাড়াতে হবে।

সামুদ্রিক সম্পদ আহরণ : ফেনী জেলায় উল্লেখযোগ্যসংখ্যক লোক (গ্রামীণ কৃষক পরিবারের মধ্যে প্রায় ১৯% পরিবার মাছ ধরার উপর নির্ভরশীল) সামুদ্রিক মাছ ধরার উপর নির্ভরশীল। উন্নত মাছ ধরার উপকরণ, বাজারজাতকরণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা, প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা, সমুদ্রে নিরাপত্তার যথাযথ ব্যবস্থা করা গেলে মাছ আহরণের পরিমাণ অনেক বাড়ানো সম্ভব। উন্নত যোগাযোগ ও পরিবহন এবং মাছ সংরক্ষণের ব্যবস্থা ও ফড়িয়াদের উপদ্রব কমানোর ব্যবস্থা জেলেদের মাছের উপযুক্ত মূল্য পেতে সহায়তা করবে। তবে মৎস্য আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে তীরবর্তী এলাকার মাছের উপর চাপ কমিয়ে আনতে হবে এবং গভীর সমুদ্রের মাছের আহরণ বাড়াতে হবে।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো উন্নয়ন : ফেনী জেলা একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ জেলা। তাই জনগণের জানমালের নিরাপত্তার জন্য উপযুক্ত অবকাঠামো যেমন বাঁধ ও পোল্ডার, স্লুইস গেট ও রেগুলেটর, সাইক্লোন শেল্টার ও সংযোগ সড়ক, কিল্লা ইত্যাদি একটি সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে নির্মাণ, ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার। প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে পর্যায়ক্রমে জেলার ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর ক্ষমতা বাড়ানো দরকার, যাতে জেলার সমস্ত লোকই ঘূর্ণিঝড়ের সময় আশ্রয় নিতে পারে। এ ছাড়া ঘূর্ণিঝড়ের সতর্ক সংকেত ব্যবস্থারও উন্নতি করা দরকার।

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি : বর্তমানে রেল যোগাযোগ উন্নত করার জন্য এবং বেশি সংখ্যক যাত্রী আকৃষ্ট করার জন্য যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে ফেনী রেলস্টেশন আধুনিকায়ন করা হবে। রেলওয়ের সিগন্যাল সিস্টেম উন্নত করা হবে, যাত্রীসেবার মান উন্নত করা হবে। ফলে রেলওয়েতে অধিকসংখ্যক যাত্রী চলাচল করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ফেনী জেলার অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য স্থানীয় সরকার ডিভিশনের অধীনে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প- ২৩ চলছে। এ ছাড়া ফেনী, সোনাগাজী সড়ক নির্মাণ। রেল লাইনের উন্নয়ন কাজও চলছে। এসব কাজ শেষ হলে জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার আরো উন্নতি হবে।

ভবিষ্যতের রূপরেখা

	২০০১	২০১৫	২০৫০
মোট লোক সংখ্যা (লাখ)	১২.০৬	১৩.৭০	১৮.০৮
পুরুষ	৫.৯৩	৬.৮২	৯.০৪
নারী	৬.১৩	৬.৮৮	৯.০৪
লিঙ্গ অনুপাত	১০০:৯৭	১০০:৯৯	১০০:১০০
শহুরে জনসংখ্যা (%)	১৪	২৫	৬০

ফেনী জেলায় বর্তমান জনসংখ্যা ১২.০৬ লাখ (২০০১)। ধারণা করা হচ্ছে এই লোক সংখ্যা বেড়ে আগামী ২০৫০ সাল নাগাদ হবে ১৮.০৮ লাখ। ২০১৫ সাল বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল বাস্তবায়নের শেষ বছর। এই সময়নাগাদ লোক সংখ্যা হবে ১৩.৭০ লাখ। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা) পূরনের জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি চলছে। মানুষের আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে। অবকাঠামো ও সরকারি পরিসেবার আরো অগ্রগতি হবে।

ফেনী জেলায় দরিদ্র মানুষের অনুপাত অত্যন্ত বেশি। সরকার দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে দেশের ২৬টি জেলা জুড়ে ৫০ কোটি টাকার একটি আয় বর্ধন কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্পে ফেনী জেলাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে জেলার অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে মাথাপিছু ১০ হাজার থেকে ২০ হাজার টাকা প্রতিজনে সুদমুক্ত ঋণ দেয়া হবে। এই টাকা দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিভিন্ন উপার্জনমুখী কাজে লাগাবে।

ফেনীতে একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ চলছে। স্বল্প ক্ষমতার এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র ১০০ থেকে ১১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে। বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে পিডিবি ও আরইবি বিদ্যুৎ কিনে গ্রাহকদের সরবরাহ করবে। ধারণা করা হচ্ছে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি স্থাপিত হলে ফেনী জেলার স্থানীয় চাহিদা মিটবে।

ঢাকা আহসানিয়া মিশন স্থানীয় এনজিওদের সহায়তায় পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উপর একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। ডিপিএইচইর সহযোগিতায় এই প্রকল্পের মাধ্যমে শহর, গ্রাম ও আর্সেনিক মিটিগেশন কম্পোনেন্টের মাধ্যমে ফেনী জেলার জনগণকে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা হবে।

ফেনী জেলার যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য বর্তমানে কাজ চলছে। সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ফেনী রেলস্টেশন ও রেল লাইনের সংস্কার ও উন্নতি সাধনে গ্রামাঞ্চল ও ইউনিয়ন পর্যায়ে রাস্তা ঘাটের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে।

ফেনী জেলায় দেশের দ্বিতীয় মহিলা ক্যাডেট কলেজ ও প্রথম সরকারী কম্পিউটার ইনস্টিটিউট স্থাপনের পরিকল্পনা ও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এই উদ্যোগগুলো সফল হলে শুধু ফেনী জেলারই নয় দেশের মানুষের জন্য কারিগরী শিক্ষা ও নারী শিক্ষার সুযোগ বাড়বে।

ফেনী জেলায় আরো গ্যাস ক্ষেত্র পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেয়ার্ন বেশ কিছু ভূ-কম্পন (সিসমিক) জরীপ চালিয়েছে। যদি যথাযথভাবে অনুসন্ধান চালানো হয় তবে এই জেলায় গ্যাস পাওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

ফেনী জেলায় কৃষি ও মৎস্যভিত্তিক মাঝারি শিল্প স্থাপন করা যেতে পারে। তবে জলবায়ুর পরিবর্তন, নদী প্রবাহ হ্রাস, নদী প্রবাহের দিক পরিবর্তন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি প্রভৃতির ফলে ফেনী জেলার বিপুল এলাকা হুমকির সম্মুখীন।

দর্শনীয় স্থান

ঢাকা ও চট্টগ্রাম জেলার যোগাযোগের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ফেনী জেলা পর্যটকদের জন্য একটি আকর্ষণীয় স্থান হতে পারে। এই জেলায় অনেক ঐতিহাসিক ও স্মৃতিবিজড়িত স্থানও আছে। এগুলো যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হলে পর্যটকদের জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় হতে পারে।

শের শাহের আমলে নির্মিত গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড ফেনী জেলার মাঝখান দিয়ে চলে গিয়েছিল। এখনো এর ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

মহুরী ক্রসড্যাম স্থানীয় জনগণের জন্য একটি আকর্ষণীয় পর্যটন স্থান ও পিকনিক স্পট হিসেবে বিবেচিত হয়।

ফেনী জেলার বেশকিছু গ্রামে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এসব ধবংসস্থল ঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা গেলে পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় হতে পারে।

ফেনী শহরের কাছেই শিলুয়া গ্রামে পাথরের তৈরী একটি বড় মুর্তি পাওয়া গেছে। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এই এলাকাটি সংরক্ষণ করছেন। প্রতিদিনই অনেক লোক এই মুর্তিটি দেখতে আসে।

ফেনী জেলার দাগনভূইয়া উপজেলায় বাংলা মাঘ মাসে ১৫ দিনব্যাপী নলদিয়া মেলা হয়। গত ২০০ বছর ধরে এই মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জেলা এবং জেলার বাইরে থেকে হাজার হাজার লোক এই মেলায় অংশগ্রহণ করে। যদি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয় এবং প্রচার বৃদ্ধি পায় তবে আরো অনেক বেশি লোক মেলায় যাবে।

চাঁদগাজী ভূইয়াঁ মসজিদ স্থাপত্য সৌকর্য্যের জন্য বিখ্যাত। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এই মসজিদটি সংরক্ষণ করছে। এ ছাড়া ব্রিটিশ আমলে নির্মিত তৎকালীন একমাত্র উচ্চশিক্ষার উৎস ফেনী ডিগ্রী কলেজ ভবন তার স্থাপত্য সৌকর্য্য দিয়ে লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত ফেনী এয়ারপোর্ট, আধুনিক তুরস্কের স্থপতি কামাল আতাতুর্কের স্মরণে স্থাপিত আতাতুর্ক স্কুল ফেনী জেলায় আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র হতে পারে।

সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিস-সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (পিডিও-আইসিজেডএমপি) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)-র একটি প্রকল্প। এটি একটি বহুখাতভিত্তিক এবং বহুপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক উদ্যোগ। একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি এবং একটি টেকনিক্যাল কমিটির নির্দেশনায় এটি পরিচালিত হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে ফেব্রুয়ারি, ২০০২ সালে।

উপকূলীয় উন্নয়নের সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা যেখানে টেকসই জীবিকা উন্নয়ন এবং জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে উপকূলীয় এলাকার উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সমন্বয় সাধন করা যায়।

এই প্রকল্পের কর্মকাণ্ডকে ছয়টি কর্মসূচিতে ভাগ করা হয়েছে-

- উপকূল অঞ্চল নীতি প্রণয়ন
- উপকূল অঞ্চলের জন্য কর্মকৌশল প্রণয়ন
- উপকূল অঞ্চলের উন্নয়নে বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন
- উপকূল অঞ্চলের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন
- প্রতিষ্ঠান ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা
- একটি সমন্বিত জ্ঞান ভাণ্ডার

বর্তমানে প্রকল্প থেকে বহু বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদনসহ উপকূল অঞ্চল নীতি প্রণীত হয়েছে। উপকূল অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের রূপরেখা প্রণয়নে উপকূলীয় এলাকার গণমানুষের পরামর্শ ও মতামত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর তাই প্রকল্প শুরুর সময় থেকে আজ অবধি সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা ও জেলাবাসীর অংশগ্রহণে অনেকগুলো বৈঠক, গবেষণা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এরই ধারাক্রমিক বিবরণ নীচে তুলে ধরা হল।

উপকূলীয় জেলার বিপদাপন্নতার কারণ অধ্যয়ন	**মে, ২০০৩**
খসড়া উপকূল অঞ্চল নীতির উপর জেলা পর্যায়ে মতবিনিময় সভা	**অক্টোবর, ২০০৩**

জনসাধারণের সার্বিক অবস্থা জানার লক্ষ্যে পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ার বিষয়টি এখানেই থেমে নেই। প্রকল্পের পরিকল্পনা অনুযায়ী এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে চলতে থাকবে। খুব শিগগিরই প্রকল্প ও জেলাবাসীর অংশগ্রহণে অংশীদারদের আলোচনা, উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হবে।